উপমহাদেশের স্বনামধন্য কবি, দার্শনিক, [illegible] এবং উর্দু কাব্যের ইতিহাসে যুগ প্রবর্তক

আল্লামা
কবি ইকবাল



ড. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
অধ্যাপিকা নূরজাহান বেগম

প্রসঙ্গকথা

সৃষ্টি সন্তানের মতো। লেখকের কাছে লেখার সম্পর্ক তেমনি মননজাত সন্তানতুল্য। আজ এই জীবন-শেষে আমার সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে কথাই বারবার মনে পড়ছে। আমারই সন্তান, দীর্ঘ দিন পর পুর্নজন্ম লাভ করতে যাচ্ছে। আমার আনন্দ তাই মাতৃসম, অতুলনীয়। সত্যিকারের কবিকে যেমন কোনও ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ রাখা যায় না, তেমনি তাঁর কালজয়ী রচনাকেও বন্দী করা যায় না কানো বিশেষ ভাষার নিগড়ে। পুস্ত কটি প্রকাশের পর তাৎক্ষণিক কোনোও সমালোচনার ঝড় ওঠেনি। বিরূপ মন্তব্যও কারো কাছ থেকে আসেনি। বরং আমার শ্রদ্ধেয় অনেক জ্ঞানী-গুণীই আমাকে মৌখিক প্রশংসা করেছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। বইটির বাজার মিলল এবং পাঠক সমাজে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হল। আমি সাহসে বুক বাঁধলাম, আশান্বিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু নানা ঘটনায় আমি আর সেদিকে এগুতে পারিনি।

কবি ইকবালের কাব্য-সাধনা কালেও খানিকটা এমনি বিশৃংখল ও অশান্ত অবস্থা ছিল উপমহাদেশ জুড়ে। তাই মনে হল প্রাচ্যের এই মহাকবির জীবন বোধ, দেশপ্রেম, দর্শন ও চিন্তা-ভাবনা যদি পুনরায় তুলে ধরা যায় আমাদের ভবিষ্যতের প্রতিভু নতুন প্রজন্মের কাছে, হয়ত তারা পথ চলায় কিছুটা আদর্শের আলোর সন্ধান খুঁজে পেতে পারে। তাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যত নতুন প্রজন্মের হাতেই আমার এই প্রচেষ্টাটুকু তুলে দিচ্ছি। এ গ্রন্থ দুচারজনের জীবনেও যদি প্রভাব রাখতে পারে তাহলে ধন্য মনে করব নিজেকে।

ড. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

সূচিপত্র

কবি পরিচিতি..... ১১
কাব্য জীবন..... ১৮
(ক) প্রথম যুগ : সূচনা পর্ব ২১
(খ) দ্বিতীয় যুগ : সাধনা পর্ব ২৩
(গ) তৃতীয় যুগ : পরিণতি পর্ব ২৭
কবি প্রেরণার উৎস..... ৪১
আধুনিক শিক্ষা ও ধর্ম ৪৮
দেশ বিদেশে স্যার ইকবাল..... ৫০
সম্মান ও সংবর্ধনা..... ৫৩
ইকবাল চরিত্রের বিভিন্ন দিক ৫৭
কতিপয় ছাত্রের সাক্ষাৎকার ৬৫
ইসলামী পতাকা প্রসঙ্গে ইকবাল ৬৭
ইকবালের মৃত্যুতে শোকবার্তা..... ৬৮
ইকবালের দার্শনিক মত..... ৭২
গ্রন্থ পরিচিত ৭৫

• সংগ্রহ ও চয়ন ৭৯
ইকবালের কবিতা ও কাব্যাংশের অনুবাদ
নালায়ে এতিম ৭৯
হিমালয় ৮৭
নয়া শেওয়াল ৮৯
শিক্ওয়াহ্ ৯০
জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্ ৯২
আসরারে খুদী ৯৪
প্রার্থনা ১১৭
পাঞ্জাবের কৃষকের প্রতি ১১৮

• চয়ন ১১৯
ইকবাল স্মরণে রচিত কবিতাবলি
ইকবাল ১১৯
স্মরণী ১২৩
শেকোয়ার কবি ১২৫
নয়রানা ১২৬
ইকবাল প্রয়াণে ১২৭

কবি পরিচিতি

উপমহাদেশের স্বনামধন্য কবি স্যার আল্লামা ইকবাল। তিনি একধারে কবি, দার্শনিক, প্রবন্ধকার এবং রাজনীতি বিশারদ। উর্দু কাব্যের ইতিহাসে তিনি যুগ প্রবর্তক কবি। ভারতের মুসলমান কবিগণের মধ্যে একমাত্র ইকবালই মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন, আর তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি পড়েছিল ইসলামের শিক্ষা দীক্ষার উপর। ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকেই আপন প্রতিভাবলে এবং একনিষ্ঠ সাধনায় রূপায়িত করে তুলেছেন তাঁর কাব্য সমষ্টিতে। ইকবাল মানসকে এই ইসলামী ভাবধারায় প্রণোদিত করার মূলে বিশেষভাব কার্যকর হয়েছিল শিয়ালকোটের বিখ্যাত আলেম মীর হাসান-এর সাহচর্য। ইসলাম থেকে শুধু তিনি অনুপ্রেরণাই গ্রহণ করেননি, অপূর্ব প্রতিভাবলে ইসলামের সার্বজনীনতা কাব্য-অঙ্গে সঞ্চারিত করে তিনি তাঁর কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। তাই তাঁর বাণী হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। মানুষের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান এবং মানবের চিরন্তন মঙ্গলবাদ তাঁর মধ্যে বিরাজ করছিল বলেই ইকবাল তাঁর কাব্যে এই সর্বমানবিক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামের মহান ভূমিকার যে পরিচয় ইকবাল দিয়েছেন তা যেমন আদর্শিক, তেমনি বাস্তব দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল।

এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দার্শনিক কবির বহুমুখী প্রতিভার সাথে বাঙালী মুসলমানদের আজও সম্যক পরিচয় ঘটেনি। ইকবালের কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আলোচনা এর পূর্বেও কিছু হয়েছে কিন্তু দার্শনিক কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ করার পক্ষে সে সব আলোচনা পর্যাপ্ত নয়। তাই কবি ইকবালকে জানা ও চেনার পথে তাঁর জীবনের কতিপয় ঘটনা ও কার্যাবলি বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরে আলোক সঞ্চার করার প্রচেষ্টা ক্ষীণ হলেও অবাঞ্ছিত বা পরিত্যাজ্য নয়।

এই প্রতিশ্রুতিবান কবির মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল প্রাথমিক স্কুলে বিদ্যাভ্যাস কালেই। কথিত আছে একদিন ইকবালের স্কুলে যেতে দেরী হয়েছিল। শিক্ষক এই বিলম্বের কৈফিয়ত চাইলে তিনি বিনা দ্বিধায় ত্বরিত উত্তর দিলেন, "ইকবাল (সৌভাগ্য) দেরীতেই আসে স্যার।" এসময়ে ইকবালের বয়স মাত্র এগারো। সেদিন ছোট্ট একটি বালকের মুখে অর্থপূর্ণ কথা শুনে শিক্ষক স্বভাবতই বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন।

এই বালক যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার বংশধারাও ছিল বিচিত্র। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ। এই বংশের পারিবারিক উপাধি ছিল সাপরু। খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেরই এক পূর্বপুরুষ এক সুফী দরবেশের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

একথা সর্বজনবিদিত কাশ্মীর পুরাকাল থেকেই উপমাহাদেশে "ভূস্বর্গ" বলে অভিহিত। পাঞ্জাবের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েই যুগে যুগে বহু শাসক সম্প্রদায় কাশ্মীরের বুকে তাদের অভিযান চালনা করেছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আকবরের রাজত্বকালে কাশ্মীর মুঘলদের শাসনাধীনে আসে। দীর্ঘদিন কাশ্মীর মুঘল বাদশাদের বিলাস, উদ্যান রূপেই বিরাজ করে। মুঘলদের পরে কাশ্মীরের শাসনভার এসে পড়ে শিখদের হাতে। শিখদের কাছ থেকে কাশ্মীরের অধিকার ছিনিয়ে নেয় ডোগড়া রাজপুতগণ।

মুঘল আমলের পরবর্তী শাসনকর্তাদের স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচারে বহু কাশ্মীরবাসী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের অধিকাংশই পাঞ্জাবে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এরকম হিজরতকারীদের মধ্যে এক সেখ খানদানও ছিল। ইকবালের পূর্বপুরুষগণ এই খানদানেরই লোক।

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এই পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোট শহরে ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন ২৪ জেলহজ্জ ১২৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ইকবাল যখন জন্মগ্রহণ করেন এই উপমহাদেশের মুসলমানদের তখন ঘোর দুর্দিন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ খুব বেশী দিন নয় শেষ হয়েছে। ইংরেজরা মুসলমানদের বিদ্বেষ ও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। মুসলমানদেরও ইংরেজদের উপর বয়ানক

রাগ। আর অনেকটা সেই কারণেই তারা ইংরেজি শিক্ষা সম্পূর্ণ বর্জন করে চলল। শুধু বর্জন নয়, ইংরেজি শিক্ষাকে তারা পাপ বলে অভিহিত করল।

এই পরিবেশে ইকবালের শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়। ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহম্মদ ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ইকবালকে মাদ্রাসায় দেয়া, কিন্তু ওস্তাদ সৈয়দ মীর হাসানের পরামর্শে এবং যুগের দাবী মেনে নিয়ে তাঁর উভয় পুত্র জ্যেষ্ঠ আতা মুহম্মদ এবং কনিষ্ঠ ইকবাল দুজনকেই মিশন স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তিনি সেদিন তাঁর বিচক্ষণতা এবং মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। সৈয়দ মীর হাসানের মত নামজাদা ওস্তাদের সাহচর্যে ইকবালের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হয়েছিল।

ইকবাল মিশন স্কুলে অধ্যয়নকালেই কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। কাব্যচর্চা কখনও তাঁর পড়াশোনার ব্যঘাত সৃষ্টি করেনি। তিনি শুধু প্রতি বৎসর স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থানই অধিকার করেননি, প্রাইমারী এবং মিডল পরীক্ষায়ও বৃত্তিলাভে সক্ষম হন। এনট্রেন্স পরীক্ষায়ও তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করে প্রশংসার সঙ্গে উর্ত্তীর্ণ হন। এর মধ্যেই স্কচ মিশন স্কুল কলেজে পরিণত হয়। ইকবাল এখান থেকেই এফ, এ, পাশ করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য লাহোর গমন করেন।

কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রাক্কালে ইকবালের পিতা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলে যে ইকবাল যেন আমৃত্যু ইসলামের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে। মৃত্যু পর্যন্ত ইকবাল এ প্রতিশ্রুতি স্মরণ রেখেছেন এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করেছেন। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে তিনি আরবি ও ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি,এ, পাশ করেন ও দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর ১৮৯৯ সালে তিনি লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম, এ পাশ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গেই তিনি ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ অল্পদিন পরেই তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

১৯০৫ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইকবাল বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর

ম্যাকটাগার্ট (Dr. Metaggart)-এর মতো প্রফেসারের পরিচালনাধীনে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Development of Metaphysics in persia নামে পারস্যের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা করে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। এই সময় ইকবাল ব্যারিস্টারীও পাশ করেন।

দীর্ঘ তিন বৎসর প্রবাস জীবন কাটিয়ে জ্ঞানগরীমা-সমৃদ্ধ ডক্টর ইকবাল ১৯০৮ খৃস্টাব্দে জুলাই মাসে নিজ দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি লাহোর সরকারী কলেজে তাঁর পূর্ব পদে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯১১ সালে পাক-ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এদেশের মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে দরদী ইকবালের হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে এবং চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

ইকবালের ব্যক্তি, জীবন আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, তাঁর জীবন, দর্শন, সূফীবাদ ইত্যাদি সব কিছুর মূলে বারবার প্রেরণা যুগিয়েছে তাঁর পিতা মাতার জীবন। এছাড়া তাঁর বাল্যজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল স্কচ মিশন স্কুলের আরবি পারসীর অধ্যাপক মৌলানা সৈয়দ মীর হাসান। ইনি ছিলেন মুসলিম সংস্কৃতির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। ইকবালের বাল্যজীবনে সূফীবাদ তাঁর মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই সুযোগ্য ওস্তাদের সাহচর্যেই তা বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে। পরবর্তী জীবনে তিনি লাহোরে লাভ করেন প্রফেসার আরনল্ডের বন্ধুত্ব। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে সুপণ্ডিত অধ্যাপক আরনল্ডের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল ইকবালের দার্শনিক ভাব-দৃষ্টি। উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় ইউরোপ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত আল্লামা ইকবাল এই দু'জনের সাহচর্য ছাড়েননি।

প্রাচ্যের এ মহাকবি ভারতের মুসলমানদের চোখে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়ে মহাপ্রয়াণ করলেন ১৯৩৮ সালের একুশে এপ্রিল। মৃত্যুকালে তাঁর কাছে ছিল পুরাতন খাদেম আলী বখ্‌স। কিছুদিন যাবতই কবি ইকবাল হৃদরোগে ভুগছিলেন। কিন্তু ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেবল ভাবতে থাকেন যে তাঁর নিজের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। তিন বৎসর রোগভোগের পর ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী

হয়ে পড়েন। দীর্ঘ নিনের অসুস্থতায় সূফী কবি ইকবাল মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। তবে তাতে তিনি বিচলিত হননি। মৃত্যুর পূর্বের দিনও তাঁর এক জার্মান বন্ধু Baron Von Valthein ইকবালের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এই সাক্ষাৎকালে ইকবাল বন্ধুর সাথে প্রায় একঘন্টাকাল কাব্য, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।

মৃত্যুর পর অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখলেন কবির ঠোঁটে হাসির রেখা। যেন জীবনের সব কাজ সমাপন করেই শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কবি নিজ বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে গেলেন :

"নিশানে মার্দে 'মু'মিন বাতু গোয়ম
চু মর্গ আয়েদ তবসসুম বর লবে উস্ত।"

অর্থাৎ আসল মুমিন বা বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি, মৃত্যুর সময় যার ওষ্ঠাধারে হাসি থাকে।

প্রকৃত মুমিন ইকবাল সহাস্যেই আলিঙ্গন করেছিলেন মৃত্যুর হিমশীতল আহ্বান।

ইকবালের বাল্য জীবন

ইকবাল নিজেই তাঁর জন্ম জীবন সম্বন্ধে কিছু মনোরম তথ্য রেখে গেছেন। জননীর নিকট থেকে গল্পচ্ছলে শোনা নিজের জন্ম কাহিনী তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ মা বলতেন আমার জন্মের পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি অপূর্ব সুন্দর সাদা কবুতর বায়ুমন্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে। কবুতরটি ঘুরতে ঘুরতে মায়ের কোলে এসে আশ্রয় নিল। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আমার পুণ্যময়ী মায়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে তাঁর আগন্তুক সন্তান অত্যন্ত ভাগ্যবান হবে।

শৈশব কালের কথা স্মরণ করে তিনি আরো বলে গেছেন যে, পিতার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রতিদিন ভোরে কুরআন শরীফ ও অযিফা পাঠ করতেন। কবির পিতাও কুরআন শরীফ পাঠ সমাপ্ত করে মাঝে মাঝে তাঁর সম্মুখ দিয়ে চলে যেতেন। একদিন ভোরে এভাবে যেতে যেতে মৃদু হেসে তিনি বললেন, বাবা যদি সময় পাই তোমায় একটি কথা বলব। কবির মনে অপার কৌতুহল;

তাই কথাটি বলার জন্য পীড়াপীড়ি করলে শেখ নূর মুহম্মদ বললেন, যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তখন বলব। পরীক্ষা পাশের পর পিতার কাছে কথাটি জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বললেন, তুমি যখন কুরআন তেলাওয়াত কর তখন ভাবতে চেষ্টা করবে আল্লাহ যেন তোমার ওপরই এ পাক কুরআন নাযেল করেছেন অর্থাৎ তিনিই যেন তোমার সাথে কথা বলছেন।'

ইকবালের ভাষ্য অনুযায়ী কুরআনের হে মানুষগণ' 'হে ঈমানদার' পড়ার সময় সর্বদাই তাঁর মনে হত চৌদ্দশ বছর পূর্বের এক নীরস কাহিনী পড়ছেন। কিন্তু পিতার স্নেহময় নির্দেশের পরে তাঁর মনে হতে লাগল কুরআন শরীফ যেন অতীতের কাহিনী, বর্তমানের প্রেরণা ও ভবিষ্যতের আশা নিয়ে তাঁর সামনে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করতেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন।

অপর একটি ঘটনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি ইকবাল তাঁর পিতার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক এবং তার নিজের জীবনের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে উদঘাটন করে. গেছেন। কবি ইকবালের পিতা শেখ নুর মুহাম্মদ অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এ তথ্য আমরা পূর্বেই জেনেছি। ঘটনাটিতে তাঁরই প্রতিফলন ঘটেছে। একদিন তিনি ইকবালকে বললেন, তোমাকে মানুষ করতে বিদ্বান করে তুলতে আমার বিস্তর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, তুমি কি তার কোনও প্রতিদান দেবে না?' এর প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইকবালের পিতার অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। স্বভাবতই ইকবাল মনে করলেন পিতা হয়ত সংসারের অসচ্ছলতার কথাই বলবেন। তিনি উৎসুক চিত্তে কথাটি শুনবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। পিতা শেখ নূর মুহম্মদ সময় হলে বলবেন বলে সেদিনের মতো ইকবালের অনুরোধ এড়িয়ে গেলেন। দিন গড়িয়ে চলল, ইকবাল ঐ কথাটি প্রায় ভুলেই গেলেন। এমন সময় একদিন তাঁর পিতা তাকে ডেকে নিয়ে বললেন, "আমি তোমার জন্য যা কিছু করেছি তার পরিবর্তে তোমার কাছে শুধু একটি জিনিস চাই। ইকবাল উৎসুক হয়ে উঠলেন জানবার জন্যে, কি সে জিনিস যা তাঁর থেকে পিতার কাম্য? শেখ নূর মুহম্মদ ধীরে ধীরে বললেন, তুমি আজীবন ইসলামের সেবা করবে, তোমার কাছ থেকে শুধু এই প্রতিশ্রুতিটুকু চাই। ইকবাল অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর পিতার হৃদয় এত বড়, এমন মহৎ!

তিনি তার সারা জীবনের স্নেহ ভালবাসা পরিশ্রম ও অর্থের বিনিময়ে নিজের জন্য কিছু চাইলেন না, চাইলেন শুধু ইসলামের সেবা করার জন্য সামান্য একটু প্রতিশ্রুতি! ইকবাল সারাজীবন ধরে পিতাকে দেয়া এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, যে কবি পরবর্তী জীবনে স্বাধীন পাকিস্তানের পরিকল্পনায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলন, তাঁর সে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেয়া নিজের পিতার কাছ থেকেই।

ইকবাল যখন লাহোরে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন তখন সেখানকার যুবকেরা তাঁর কিছু কবিতা ইসলামী জাতীয় সংগীত রূপে চতুর্দিকে গেয়ে বেড়াত। শেখ নূর মুহম্মদ তখন মৃত্যু শয্যায়। সংবাদ পেয়ে ইকবাল লাহোর থেকে পিতাকে দেখতে এলেন। তিনি পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে তাকে বললেন, আব্বা আপনি তো পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করে বিদায় নিতে চলছেন কিন্তু আমি তো আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলাম না। এ কথা শুনে তার পিতা অশ্রুসিক্ত চোখে উত্তর দিলেন তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি সম্পুর্ণ পূরণ করেছ। আমার এ মৃত্যুশয্যায় তোমার ইসলামী গানের সুর যখন থেকে শুনতে পেয়েছি তখন থেকেই আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে তুমি ইসলামের সেবা করে তোমার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ পূরণ করেছ।'

কাব্য জীবন

ওস্তাদ সৈয়দ মীর হাসানের কাছে মৌলানা জালালুদ্দিন রুমীর ফারসী কবিতা শুনে শুনে ছেলেবেলা থেকেই ইকবালের কাব্যে আসক্তি জন্মে। এর উপর পিতার সুমধুর কণ্ঠে রুমীর মসনবী পাঠ শুনে তাঁর বালক হৃদয়ে যে অপূর্ব উন্মদনা সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ শিয়ালকোট অবস্থানকালেই তিনি দু'একটি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। শিয়ালকোটের কাব্য চর্চার সেই প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলার পূর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করলেন লাহোর আসার পর। ১৮৯৫ সালে লাহোর আসার পর উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইকবালের মনের অঙ্কুরিত কাব্যধারাও উন্মেষ লাভ করতে থাকে।

ইকবালের কাব্য জীবনের সূচনার উল্লেখ করে লাহোরের এডভোকেট মৌলবী আহমদুদ্দিন বলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে লাহোরের ভাট্টি দরোজার অভ্যন্তরে প্রসিদ্ধ ব্যাবিস্টার আমীনুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে এক মুশায়েরা মজলিসের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। হাকিম শুজাউদ্দিন ছিলেন এ মুশায়েরার মীরে মজলিস এবং মীর আরশাদ গুরগানী এবং নায়েব হুসেন লাখনোভী প্রমুখ আলেমগণ এর সভ্য ছিলেন।

যখন এ মুশায়েরা মজলিস চলত তখন দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ প্রভৃতি দূর দেশ থেকে কাব্যপ্রেমিকগণ এতে যোগ দিতেন। কলেজের তরুণ ছাত্র কবিরাও এই সভায় যোগ দিয়ে কবিতা পাঠ করত এবং প্রবীণ কবিদের কাব্য প্রতিযোগীতায় শরিক হয়ে আমোদ উপভোগ করত। এই তরুণদের দলে একদিন ইকবালের আবির্ভাব হল। তরুণ মনের বহু আশা ও স্বপ্ন ইকবাল সেদিন গাইলেনঃ

'মুতি সমজ্‌কে শানে করিমি নে চুন লিয়ে
কতরে জু থেষমেরে আরকে ইন্‌ফেয়ালকে।
অর্থ - জীবন প্রভাতে মোর উঠেছিল স্বেদবিন্দু কপোল সীমায়
প্রতিভা মুকুতা ভ্রমে লুটে নিল তাহা সবে গোপন চুমায়।

সেদিন আরশাদ গুরগানীর মতো বড় বড় আলেমরাও অকুণ্ঠিত প্রশংসায় ইকবালের উদীয়মান প্রতিভাকে সম্মান দেখিয়েছিলেন।[১]

বলাবহুল্য এ সময় ইকবাল গজল এবং গীতি কবিতাই রচনা করতেন বেশী। এই সময় উত্তর ভারতে উর্দু সাহিত্যের পূর্ণ জাগরণের সূচনা দেখা দিয়েছে, হায়দরাবাদের রাজকবি দাগ তখন কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। ছাত্র জীবনেই দু'একটি কবিতা লিখে ইকবাল দাগের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদানের মারফত সে স্নেহ গভীরতায় পরিণতি লাভ করেছিল। ইকবাল কবিতা ও গজল লিখে সংশোধনের জন্য কবি দাগের কাছে পাঠাতেন। কবি দাগও ইকবালের লেখায় বিরাট সম্ভাবনার পরিচয় পেয়ে এমন শিষ্যের গুরু হবার সৌভাগ্যে যথেষ্ট আনন্দিত হলেন।

লাহোরের আবহাওয়ায় কবি ইকবালের কাব্যশক্তি যে প্রেরণা লাভ করেছিল তারই ফলে ১৮৯৫ সালে লাহোরের আঞ্জুমান হিমায়েত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় তিনি তাঁর 'নালায়ে এতিম, বা এতিমের কান্না কবিতাটি পাঠ করেন। এতদিন পর্যন্ত কাব্যখ্যাতি তাঁর বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। নালায়ে এতিম নিয়েই তিনি সাধারণের সামনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। সেদিন কবির কণ্ঠে যে প্রাণঢালা গভীর দরদ আনুরণিত হয়ে উঠেছিল তাতে দেশবাসী মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। এর উপরে কবিতাটির মধ্যে ছিল অধঃপতিত দেশ ও ঘুমন্ত জাতিকে কর্মোন্মদনায় অনুপ্রাণিত করার দুঃসাহসিক সাধনা। তাই পণ্ডিত সমাজে কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেতে ইকবালের বিলম্ব হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর দু'এক বৎসর আগে ইকবালের কাব্য জীবন আরম্ভ হলেও ইকবালের কাব্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর প্রকাশিত কবিতা 'হিমালা'র প্রকাশ থেকে। ১৯০১ সালে লাহোরেরই এক মুশায়েরায় ইকবাল 'হিমাল' কবিতাটি আবৃত্তি করেন এবং তরুণ সাহিত্যিক ব্যারিস্টার আব্দুল কাদের সেই সালেরই এপ্রিল মাসে তাঁর প্রকাশিত মাখযান পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে কবিতাটি প্রকাশ করেন। এই কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে সাড়া পড়ে যায়। কবিতাটির অপূর্ব দেশাত্মবোধ সকলকে যেমন করেছিল উৎসাহিত, তেমনি

---

[১] শায়েরে আযম ইকবাল-আবুয যোহা নূর আহমেদ

ফারসী ছন্দ ও ইউরোপীয় ভাব সমন্বয়ে যে কাব্যরস উৎসারিত হয়েছিল তার সৌন্দর্যে দেশবাসী হয়েছিল মুগ্ধ।

১৯০১ সালে নালায়ে এতিম কবিতাও মাখযানে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর থেকে বিলেত যাবার পূর্ব পর্যন্ত মাখযানের প্রতি সংখ্যায় ইকবালের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। বস্তুত ইকবাল প্রতিভা সেদিন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলতে পেরেছিল মাখযানকে অবলম্বন করেই।

প্রস্তুতি পর্ব বাদ দিলে ইকবালের কাব্য জীবনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম যুগ -- ১৮৯৯ সাল অর্থাৎ হেমায়েতে ইসলামের সভায় নালায়ে এতিম পাঠের পর থেকে ১৯০৫ সালে অর্থাৎ বিলাত যাত্রা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় যুগ -- ইউরোপ প্রবাস কাল অর্থাৎ ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সাল।

তৃতীয় যুগ -- ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৩৮ অর্থাৎ ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর মৃত্যু পর্যন্ত।

(ক)
প্রথম যুগ : সূচনা পর্ব

প্রথম যুগে 'নালায়ে এতিম' ও 'হিমালা'র কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ দু'টি কবিতা ছাড়া ইকবালের আরো বহু কবিতা এ সময়ে মাখযান এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। স্বদেশপ্রীতি এবং অধঃপতিত জাতিকে অসহায় অবস্থামুক্ত করার আকুতিতে উদাত্তভাবে যে মনোমুগ্ধকর সুর ঝংকার তিনি তুলেছিলেন তারই ব্যঞ্জনায় কবিতাগুলি ভাস্বর দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে 'সদা এ দর্দ' 'তসভীরে দর্দ' 'তারানা এ হিন্দী' 'নয়াশীওয়াল' 'ওয়াতন ওহী হ্যায়', 'গুল-ই-রঙীন' 'শামা ও পরওয়ানা', 'এক আরজু' 'চাঁদ' 'রবিকিনারে' ইত্যাদি কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের কবিতাবলির কতকগুলিতে ইকবালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও দৃশ্যের বর্ণনার প্রতিও প্রবণতা দেখা যায়। 'প্রাতঃকাল' 'বর্ষা', 'সন্ধ্যা', 'নতুন চাঁদ', 'পর্বত প্রান্ত' তারই পরিচয় বহন করে। শিশুদের জন্য এ যুগে যে কবিতা রচিত হয় তাদের মধ্যে 'শিশুর প্রার্থনা', 'পর্বত ও কাঠবিড়ালী', 'পাখীর নালিশ', 'মায়ের স্বপ্ন' প্রভৃতি। ভাবুকতা পূর্ণ কবিতাও এ সময়ে তিনি কিছু কিছু রচনা করেছিলেন। যেমন 'প্রেম ও মৃত্যু', 'হৃদয়', 'বাতি ও পতঙ্গ' ইত্যাদি।

এযুগের রচনায় কবির ভাবের বাহন ছিল উর্দু কিন্তু ভাব কল্পনার অনেক জায়গায় প্রভাবন্বিত হয়েছেন ইংরেজ কবিদের প্রভাবে। অবশ্যি সেকালের সমস্ত উর্দু কবিই কম বেশী ইংরেজি প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। কবিতাগুলির সর্বত্র পুরাতনকে বর্জন করে নতুন চেতনায় উদ্বোধিত নবভিত্তিক কাব্য সৃষ্টির অভিনব প্রয়াস লক্ষিত হয়।

'তারানায়ে হিন্দী' ও 'নয়া শিওয়াল' এ যুগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবিতা। 'তারানায়ে হিন্দীর', 'সারা জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামার' বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের জনসাধারণকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বোধিত করেছিল। ইকবালের

মৃত্যুর পর তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের চিঠিপত্রে এর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী এক অধ্যায়ে কিছু চিঠিপত্র সংযোজিত করা হবে।

এ সময়ের অন্যতম বিখ্যাত কবিতা 'এতিমের খেতাব হেলালের ঈদ'। নালায়ে এতিম' পাঠ করার পরের বৎসর আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভাতেই কবি উপরোক্ত কবিতাটি পাঠ করেন। অগণিত শ্রোতা বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধর মতো ঈদের চাঁদকে উপলক্ষ করে কবি হৃদয়ের ব্যথার আকুতি সেদিন শুনেছিল।

এমনিভাবে ইকবাল ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যে কাব্য সৃষ্টি করলেন, তারই মধ্য দিয়ে তিনি লাভ করলেন খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। তার চাইতেও দুর্লভ তিনি যা লাভ করেছিলেন সে হল দেশের শীর্ষস্থানীয় গুণীদের সান্নিধ্য। ইকবালের প্রাথমিক লেখায় ফসিহুল মুলক দাগের প্রভাব কিছুটা দেখা গেলেও মূলত তিনি গালিবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গালিবের রচনার উচ্চ চিন্তা, উন্নত ভাব ও মননশীলতা কবিকে যতখানি আকর্ষণ করেছিল অন্য কোনও কবি ততখানি পারেনি। আরশাদ গুরগাণীর সাহচর্য ইকবালের কাব্য জীবনকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করতে সমর্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই এবং সংশোধনের মধ্য দিয়ে লেখাকে ত্রুটিমুক্ত করতে তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন কবি দাগের কিন্তু উচ্চ চিন্ত ার জন্য তিনি দৃষ্টি ফেরালেন কবি গালিবের দিকে। এই উচ্চ চিন্তার বীজ তিনি লাভ করেছিলেন জন্মসূত্রে পিতা মাতার জীবন থেকে। তা-ই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল পরবর্তী কালে মনীষী মীর হাসান ও ডক্টর আরনল্ডের শিক্ষা সাহচর্যে।

যশ, মান, প্রতিপত্তি লাভ করেও ইকবালের সুখী মন অশান্ত হয়ে উঠল বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সংযোগ লাভের আশায়। পাশ্চাত্যে জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে ভবিষ্যৎ কাব্য জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার মানসে ১৯০৫ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

(খ)
দ্বিতীয় যুগ : সাধনা পর্ব

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ইকবাল বিলাতে ছিলেন। এ সময় তিনি ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে এম, এ, জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি এবং লিঙ্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। তার পি-এইচ-ডি-র নিবন্ধ (Thesis Development of Metaphysics in Persia) পুস্ত কাকারে প্রকাশিত হলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। আরনল্ড সাহেব তখন বিলেতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক। তিনি ছয় মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করলে ইকবাল সে স্থলে আরবীর অধ্যাপক নিযুক্ত হবার গৌরব লাভ করেন।

বিলেতে থাকাকালে বহু মনীষীর সঙ্গে মেশার এবং ভাব আদান প্রদান করার সুযোগ ইকবালের হয়েছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসের লেখক ই, জি, ব্রাউন (E.G. Browne) এবং ডক্টর নিকলসন (Dr. Nicholson)। প্রথম মনীষীর প্রভাবে তিনি তার বিস্মৃতপ্রায় পারস্য ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন আর দ্বিতীয় মনীষী পরবর্তী কালে ইকবালের ফারসী গ্রন্থ আসরার-ই-খুদীর ইংরাজি তরজমা প্রকাশ করে বিশ্ববাসীর সঙ্গে ইকবালের পরিচয়ের পথ সুগম করে দেন, এর কিছুদিন পরেই ভারত সরকার ইকবালকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তিন বৎসর বিলাত থাকার সময় কবি ইকবাল এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেননি-বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগারে গিয়ে সারা পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার সাধনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকতেন। মানুষের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনাকে যথারীতি রূপদান করতে হলে যে গভীর জ্ঞান ও সাধনা প্রয়োজন এ কথা ইকবাল কখনও বিস্মৃত হননি। ইউরোপের জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করে তিনি তার উচ্চতর চিন্তা পাথেয় সয়ংগ্রহ করেছেন।

খুব কাছে থেকে দেখা : ইউরোপ থাকাকালে ইকবালের ভাব জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। ইউরোপকে বিশেষভাবে জানার সুযোগ পেয়ে তিনি পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কোনও আশার আলো দেখতে পাননি, তেমনি সেখানকার কাব্যরাজিতে তিনি দেখতে পাননি উচ্চতর জীবনের কোন নিদর্শন। এসব কারণেই কাব্যচর্চায় বৃথা কালক্ষয় না করে তিনি কবিতা ছেড়ে দিতে মনস্থ করেন। মাখযানে'র সম্পাদক শেখ আবদুল কাদির তখন বিলেতে। ইকবালের এই সংকল্প শুনে তিনি মর্মাহত হন। তার অনুরোধ উপরোধে ইকবাল শেষ পর্যন্ত ডক্টর আরনল্ডের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং প্রধানত তাঁরই উপদেশে পুনরায় কাব্যচর্চায় মনোসংযোগ করেন।

এসময়ের কবিতা আলোচনা করলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইকবালের অন্তরে এশিয়ার ভাবুকতার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে ইউরোপের কর্মবাদ, স্থিতির পরিবর্তে কবিকণ্ঠে অনুরণিত হয়েছে গতিবাদের প্রশান্তি। নীটশের দর্শনের সাথেও এ সময়ে কবির পরিচয় ঘটে এবং এতে কবি যে খানিকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাও অস্বীকার করা যায় না। নীটশের অন্ধ অনুসরণ তিনি করেননি। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে "তিনি লোকোক্তির রাজহংসের ন্যায় ইউরোপের মন্দ নীর ছাড়িয়া ভাল ক্ষীরই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" সত্যিই তাই, ইউরোপের যা কিছু খারাপ, মানব কল্যাণের পরিপন্থী, ইকবাল সযত্নে তা পরিহার করেছেন। অন্যদিকে যা কিছু ভাল, মানব চরিত্র বিকাশের সহায়ক; তা সানন্দে বরণ করে নিতে ইতস্তত করেননি। তাই দেখা যায় নীটশের অতিমানববাদ (Superman) এক সুষ্ঠু রূপ পেয়েছে ইকবালের হাতে। এই পাশ্চাত্য দার্শনিকের শিক্ষার সাহায্যেই তিনি অনুভব করলেন ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য, কবির হৃদয় বীণায় ঝংকৃত হয়ে উঠল-

আনতুম খায়েরা উম্মাতিন

অর্থাৎ তোমরাই শ্রেষ্ঠ মানব।

নীটশের মতে ক্ষমতাই (মসনদ) চরম লক্ষ্য। কিন্তু কেন? এ উত্তর আমরা তাঁর মধ্যে পাইনে। এই কেন'র উত্তরই ইকবাল দিলেন, ইসলাম ও কোরানের আদর্শের ভিত্তিতে।

ক্ষমতার প্রয়োজন বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য, ধর্মকে সংরক্ষণের জন্য এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। পাশ্চাত্য দার্শনিকের অতিমানব ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে 'ইনসানে কামেল'। এই সাধনায় মানবকে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশই ইসলাম বার বার দিয়েছে। এই 'ইনসানে কামেল'-এ পরিণত হওয়াই হচ্ছে মুসলমানদের আদর্শ। তাই দেখা যায় পাশ্চাত্য দার্শনিকের বাণী হল- 'জগৎ দুর্বলের জন্য নয়, শক্তিমানের জন্য।' অপর দিকে প্রাচ্য দার্শনিক ইকবাল অধঃপতিত ইসলামী সমাজকে জাগরণের মন্ত্রে উৎসাহিত করে বলেন:

'উঠ' প্রাচ্যে উঠেছে অন্ধকার আকাশের সীমান্তে,
চল আমরা তা দূর করি অগ্নি গানের সাহায্যে
চল আমরা দুর্বল শিশির কণাকে জাগাই
এবং নদীতে পরিণত করি।
চল আমরা মোমবাতির মত বাঁচি
নিজেকে দান করে কিন্তু সকলকে আলো দিয়ে।

প্রাচ্য কবির এই অপূর্ব আত্মত্যাগের ইঙ্গিত ইউরোপীয় জগতে দুর্লভ। তথাপি ইউরোপীয় জগৎ থেকে তিনি যে চিন্তার খোরাক লাভ করেছিলেন অকুণ্ঠিত চিত্তে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে ঋণ স্বীকার করতে কখনও পরান্মুখ হননি। তিনি বলেছেন ঃ

'খিরদ আফযুদ মেরা দর্সে হকিমানে ফিরঙ্গ.
'সীনাঃ আফ্রোখ্‌ত মেরা সুহ্‌বতে সাহিবে নযরাঁ'
অর্থাৎ ইউরোপের জ্ঞানীগণ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছেন।
দিব্যজ্ঞানীদের সংসর্গ আমার হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছে।"[১]

সুচনা যুগে ইকবালের ভাবধারার বহন ছিল গজল। অবশ্যি তাতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকত প্রচুর। কবি তখন হিন্দুস্তানের সকল জাতির প্রতিনিধি। তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ে কবিতায় এল পরিবর্তন। হিন্দুস্তানের কবি সারা মুসলমানদের কবি হয়ে দাঁড়ালেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সমন্বয়ে কথা ও কাব্যে এল নতুন সুর, নব ভঙ্গী। ভাষার দিক দিয়েও পরিবর্তন কম

[১] ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুবাদ।

এল না। উর্দুর পরিবর্তে ফারসী ভাষাকে করলেন তাঁর ভাবের বাহন। সূফী ভাব পূর্ণ নিগূঢ় সূক্ষ্ম ভাবসমূহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা অনেক সময় কষ্টকর হয়, তাই তিনি উর্দুর পরিবর্তে ফারসী গ্রহণ করেছিলেন বলেই সাধারণের ধারণা। তবে বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য এর সঙ্গে জড়িত ছিল এ সম্বন্ধে কবি নিজে বলছেনঃ

'গরচি হিন্দি দর উজুবৎ শকর অস্ত
তরজে গুফ্তারে দরী শীরীতর অস্ত
ফারসী আজরফ আতে আনদেশা আম
দর খোরদ বা ফিতরতে আনদেশা আম'

অর্থাৎ, যদিও হিন্দি ভাষা চিনির মত মিষ্টি কিন্তু ফারসী ভাষার ভঙ্গী আরও মধুর। এ ভাষার সৌন্দর্যে আমার মন মুগ্ধ। আমার উচ্চ ভাবের যোগ্যতম বাহন হবে এই ফারসীই। তোমরা শুধু রসের বিচার করো পাত্রের সঙ্গে বিবাদ করো না।

এ যুগে লিখিত কবিতার মধ্যে মোহব্বত হকিকত', 'ইহসন' 'কোশেশই নাতামাম', 'পায়ামে ইশক', 'পায়াম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবিতাগুলির বাংলা নাম যথাক্রমে দাঁড়ায় 'সৌন্দর্যের সত্য', 'অসম্পূর্ণ চেষ্টা', 'প্রেমের বাণী'।

নামকরণ থেকে এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কবি এ সময়ে বিশেষভাবে তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছেন।

মোট কথা, কবির বীণায় ধ্বনিত হল নতুন সুর। স্থিতির পরিবর্তে গতি, জাতীয়তার পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতা, স্বদেশ স্থলে স্বজাতি প্রীতি কাব্যের বন্ধনে ধরা পড়ল। কবির মতে–

'নিবালা সরে জাঁহা সে উসকো আরবকে মু'আম্মার নে বানায়া।
বিন হামারে হিসাবে মিল্লাতকী ইত্তিহাদে ওতন নেহী হ্যায়।'
অর্থ - আরবের রাজমিস্ত্রী বানিয়েছেন একে পৃথিবীর
সকল দেশ থেকে বিশিষ্ট করে,
আমাদের স্বজাতির কেল্লার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা স্বদেশের
ঐক্যের উপর নয়।[২]

---

[২] ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুবাদ।

(গ)
তৃতীয় যুগ : পরিণতি পর্ব

ইউরোপ প্রবাস শেষ করে ১৯০৮ সালে দেশে ফেরার পর থেকে ১৯৩৮ সালে জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত কবি ইকবাল একান্ত মনে কাব্য সাধনা করে যান। এই যুগ ইকবালের কাব্য জীবনের ইতিহাসের এক সুবর্ণ অধ্যায়।

অদ্ভূত এক জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ইউরোপ থেকে দেশে ফেরেন। এই নব্য সভ্যতার বাইরের আড়ম্বর সমগ্র পৃথিবীর চোখ ঝলসে দিলেও ভেতরে একেবারে অসার। শেতাঙ্গ সভ্যতা ও পশ্চিমী চিন্তাধারার মোহ ইকবালের মনেও মোহ সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপ ভ্রমণ এবং প্রতীচ্য তমদ্দুনের নিকটতর পর্যবেক্ষণ সে মোহ ভঙ্গ করে দিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচ্যের শিক্ষা দীক্ষায় গভীর জ্ঞান। এই অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি পূর্বের চাইতেও নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে দেশে ফিরলেন। এ যুগের কবিতাবলিতে কবি মনের উদাসীন ভাব কিছুটা পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে। মনে তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা কিন্তু তিনি সে জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না, শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

কবির মানসিক অবস্থা যখন এমন ঠিক তখনই মুসলিম দুনিয়ায় পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটে যায়- জাতীয় জীবনে যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ইকবালের ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পরেই ইটালী তুরস্কের ত্রিপলী ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনায় উপমহাদেশের মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে উঠল। তারা মনে করতে লাগল তুর্কী খেলাফতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শেষ ধর্মীয় আশ্রয়টুকুও নিঃশেষে ধসে পড়ল। কবি ইকবালের ইসলামী ভাবপূর্ণ মনও এতে গভীর বেদনায় ভরে উঠল এবং এ ঘটনা উপলক্ষ করেই তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের অসহায়তার বেদনাকে মূর্ত করে তুললেন তাঁর বিখ্যাত খণ্ডকাব্য শেকওয়ায়। কাব্যটির ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠল সর্বশক্তিমান খোদা তায়ালার প্রতি অভিমান ও অভিযোগ।

১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় তিনি সুদীর্ঘ শেকওয়া পাঠ করেন। ইটালীর হাতে ত্রিপলীর পতন সংবাদে ভারতের মুসলমানগণ এমনিতেই মর্মাহত হয়েছিল-তার উপরে কবি-কণ্ঠে মধুর অথচ আবেগঘন সুরে এই অগ্নিগান শুনতে শুরতে শ্রোতৃবর্গের শোকোচ্ছাসের বেগ আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। দুঃসাহসী কবি খোদাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে ইতস্তত করেননি।

শেকওয়া'য় কবির মর্মবাণী মথিত করে খোদার প্রতি যে নালিশ উৎসারিত হয়েছিল তার ভাব অশ্রুভারাক্রান্ত, ভাষা তীব্র। যেমন ঃ

মুখর হয়েছে আকাশ-হে খোদা যুগ যুগ তব বন্দনা গীত রবে,
এবার একটু বন্ধু তোমার ভক্তজনের নিন্দা শুনিতে হবে।
কত জাতি তুমি সৃষ্টি করেছ কত শত যুগ ধরে,
শুনিতে কি পাই কে করেছ কিবা কোথায় তোমার তরে ?
তোমার নামেতে ধরা তেগ তলোয়ার-
সে তো আমরাই ক'রেছি প্রথম, সে তো আমাদেরি
একচেটে অধিকার।
তবে কেন আজ এই অপবাদ মোরা নই ওফাদার ?
তাই যদি হয় তবে তো তুমিও নহ নহ দিলদার।
বুলবুল কাঁদে শুনিয়া রহিব নিশ্চুপ বিলকুল।
হয়ে খোদা শোন আমরা নহিত ফুল।

শুধু মরুভূমি নয়,
তোমার তরেতে করিনি সাগরেও কভু ভয়।
দুরন্ত অতলান্টিক-ঢেউ একদা তুচ্ছ করে
ছুটায়েছি ঘোড়া, সে শুধু তোমার তরে।
চিরদিন তব প্রশংসাবাদ গাহিয়া এসেছি সবে,
আজিকে একটু বন্ধু তোমায় নিন্দা শুনিতে হবে।

তোমার বাণীরে ভুলেও যাহারা করেনি গ্রহণ কভু,
ছড়ায়েছ তুমি সব কিছু তব তাহাদেরই তরে প্রভু,

শুধু আমাদেরই মাথায় ক'রলে অসহ বজ্রপাত।
দুনিয়ার যত আরাম আয়াশ হুরপরী জিন্নাত
নাসারারা পেল সব,
প্রতিশ্রুতিতে আমাদের শুধু ক'রেছ তুমি নীরব।[১]

কবিতাটির ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়েছে কবি হৃদয়ের নিরঙ্কুশ বেদনা।

আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় কবিতাটি পাঠ করার পর দেশের তরূণ, বৃদ্ধ সবার মধ্যেই বিপুল আলোড়ন দেখা দেয়। তরুণ সম্প্রদায় এগিয়ে আসে কবিকে অভিনন্দন জানাতে কিন্তু প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজ কবির ধৃষ্টতা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁদের মতে খোদার বিরুদ্ধে নালিশ ইসলাম-বিহর্গিত কাজ সুতরাং ইকবালের এ অভিযোগ বিদ্রোহের পর্যায়ভুক্ত। অনেকে মনে করেন এই রক্ষণশীল সমাজকে সান্তনা দেবার জন্যই ইকবাল পরে 'জওয়াবে শেকওয়া' লিখেছিলেন। 'শেকওয়া' কাব্যে কবি শুধু অভিযোগই করেননি খোদাতায়ালার অসীম অনুগ্রহের আশায় উন্মুখ হওয়ার পরিচয়ও এই কাব্যে পাওয়া যায়।

তাই আশাবাদী কবির মনে মুসলিম সমাজের অধঃপতন সত্ত্বেও ভবিষ্যতের মহান সম্ভাবনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর সেই সম্ভাবনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার পথে তিনি অসীম করুণাময় আল্লাহতায়ালার সাহায্য ভিক্ষা করেই 'শেকওয়া' কাব্যের উপসংহার করেছেন।

খোদার দরবারে কবির আবেদন ঃ

'মুশকিলে উম্মতে মরহুম কী আসাঁ কর দে,
মোরে বেমায়া কো হম্‌দোশে সুলায়মা কর্ দে।"
জিন সে নায়াবে মুহব্বতকো ফির্ আরযাঁ কর্ দে,
হিন্দকে দেহের নশীনো কো মুসলমাঁ কর দে।
জোত্র খুঁমী চকদ আয হসরতে দীরীনা এ মা
মী তপদ নালা-নস্‌তর কদা এ সীনা এ মা।'

---

[১] কবি ইকবাল– মুহম্মদ হাববুল্লা।

অর্থ –

'দয়ার পাত্র এ উম্মতের মুশকিল তুমি আসান কর,
বেচারা এই পিঁপড়েদের সুলায়মানের সমান কর।
দুর্লভ প্রেমটি আবার মোদের সুলভ ক'রে প্রদান কর
হিন্দের এই মঠবাসীদের ফের তুমি মুসলমান কর।
জমাট দুখে রক্তধারা নয়ন হ'তে পড়ছে ঝ'রে,
অস্ত্রক্ষত বক্ষে মোদের উঠছে ব্যথা চীৎকার করে।'[২]

'জওয়াব এ শেকোয়া'তে ভক্তের নালিশের উত্তরে খোদার জবাব। মুসলমানগণ, কোরানের পথ ইমানেরপথ থেকে দূরে সরে গেছে বলেই যে তাঁদের এ দুর্গতি-এ কথাই এ খণ্ড কাব্যটিতে বার বার বলা হয়েছে। খোদা তায়ালা মুসলমান জগতের প্রতি বিরূপ এ অভিযোগের উত্তরে বলেন ঃ

'অভিযোগ এনে ভালই করেছ হে প্রিয় ভক্তগণ
মানুষকে আজ দিয়েছ তোমরা সম্মুখে মোর আনি।
আমার যা কিছু রয়েছে তা সবি তোমাদের চাই দিতে
তোমরা জান না নিতে।
সাধক যাহারা তাদেরে করেছি সদাই মহিমা দান,
সন্ধানীদের দিয়েছি নতুন জগতের সন্ধান।
তারাও ছিল নবীজীর উম্মত,
তারাও ছিল ভক্ত মুসলমান।
আযান তো আজও চলেছে এখনও, বেলাল শুধুই নাই।
দর্শন আজো রয়েছে বাঁচিয়া, গাজজালী কোন ঠাই?[৩]

মুসলমানের জন্য রেখেছেন খোদা কেবল হুরের অঙ্গীকার-এ অভিযোগের উত্তরে জওয়াব এ শেকওয়াতে দেখা যায় :

কেয়া কাহা? বহরে মুসলমাঁ হ্যায় ফকত ওয়াদায়ে হূর,
শেক্ওয়াহ বেজা ভী করে কোই তো নাযিম হ্যায় শউর।
আদল হ্যায় ফতিরে হস্তী কা আযল সে দস্তূর,

---

[২] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনুবাদ হতে গৃহীত।
[৩] কবি ইকবাল- মুহম্মদ হাবিবুল্লা।

মুসলিম আইন হুআ কাফির তো মিলে হূর ও কসূর।
তুম্ মেঁ হূঁরো কা কোঈ, চাহনেওয়ালা হী নাহী
জলওয়াত্র তুর্ তো মৌজুদ হায় মুসা হী নাহী।'

অর্থ –
'বল্লে ভাল, মুসলিম তরে শুধুই হুরের ওয়াদাখানি!
নিন্দা মিছে করলে নাকি বরলে নাকি বলবে লোকে গুণী জ্ঞানী?
সৃষ্ঠিকর্তা ন্যায়বিচারী, এই চিরকাল দস্তুর জানি,
বধর্মী পায় হূর ও দৌলত নিলে আইন মুসলমানি।
কি কব দুঃখের কথা কেউ তোমাদের চায়না হূর,
মুসা কৈ? নয়ত আজো তুর পাহাড়ে ঐ যে নূর।[১]

অতীতের মুসলমান ও বর্তমানের মুসলমানদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ---জওয়াব-ই-শেকওয়াতে সেই পার্থক্যই সূচিত হয়েছে। এ কথা স্মরণ রেখেই হয়ত পরে তিনি লিখেছিলেন-

'শবে গরিফাঁন হোগি আখের জল্লুয়ে খুরশী পে
ইয়ে চমন মামুর হোগা নাগমায়ে তৌহিদ পে।'

অর্থ– রাত্রিখানি পোহাইবে সূর্যের রশ্মিতে
এ বাগান গুঞ্জরিবে তৌহিদের গীতে।

এই শেকওয়ার জবাবে আল্লার তরফ থেকে বলা হয়েছে :
'জাব্বে হোতে হেঁ সমজেদ মে ছফআরা তু গরীব
যহমত রোগা জু করতে হে গাওয়ায়ী তু গরীব।

অর্থাৎ বর্তমানে ভোগবাদের নেশায় উন্মত্ত মুসলমানগণ সত্যিকার মুসলমান নয়। আজ যারা নামাযের জন্য মসজিদে যায়, রোযা রাখার কৃচ্ছ স্বীকার করে, তাদের হৃদয়েই আল্লার নাম মওজুদ আছে। তাদের কণ্ঠের খোদাস্তুতিই আমাকে সম্মান দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছেঁ কিন্তু তারা একান্তই

[১] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুবাদ।

গরীব। বড় লোক যখন ধনের নেশায় মত্ত তখন শুধু গরীবদের চেষ্টায়ই ইসলাম বেঁচে আছে। কিন্তু

'ওয়ায়েয কাউম কি উহে পোক্তা কেয়ালি না রহি
বরকে তর্‌য়ি না রহি মোয়ালা মফালি না রহি।'

অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে পূর্বের মতো চিন্তার গভীরতা নেই, তাদের কথায় বা কাজে নেই পূর্বেকার সেই বিশ্বাসের তেজ। বেলালের সঙ্গে সঙ্গে আযানের সেই মোহময় আবাহনী শক্তি লোপ পেয়েছে, সঙ্গে তিরোহিত হয়েছে ইমাম গাযযালির সঙ্গে দর্শন শাস্ত্রের সেই গভীরতা। মসজিদ বিলাপ করছে, নিবেদিত প্রাণ সেই নামাযী আর হেজাজে বিচরণ করে না।

'হাম ইয়ে কাহতে হেঁ কে বিহি কেঁহি মুসলেম মওজুদ
ওযে মে তুম হো নাছরে তমদ্দুন মে হুনদ।'

আমি এ কথাই বলব, খাঁটি মুসলমান কি সত্যি সত্যি আছে? বেশভূষায় তুমি খৃস্টান, সভ্যতায় হিন্দু। তুমি সৈয়দ, মির্জা বা আফগান যাই হও না কেন তুমি কি সত্যি খাঁটি মুসলমান ?

এভাবে জওয়াব-ই শেকোয়াতে খোদার তরফ থেকে মুসলমানদের বলতে চেয়েছেন যে তাদের নিজের দোষেই আজ তারা পৃথিবীতে ঘৃণিত ও সর্বস্বান্ত। তাই খোদার কাছে তাদের যা অভিযোগ তা একান্তই অর্থহীন। অবশ্যি কবি মুসলমানদের সুপ্ত আত্মা আর চেতনাকে জাগ্রত করার মন্ত্রে উদ্বোধিত করে খোদার জবাবের উপসংহার করেছেন।

আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় 'শেকওয়া' পাঠ করার পর, সেই বৎসরই অক্টোবর মাসে কবি লাহোরের শাহী মসজিদে 'দরবারে রিসালত' নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা আবৃত্তি করেন! হযরতের সাথে কাব্যলোকে দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতাটিতে তিনি রূপ দিয়েছেন শহীদদের হৃদয়ের রক্তে-রঞ্জিত ত্রিপলী যুদ্ধের কথা। কবিতাটির মর্মস্পর্শী করুণ রস উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে কান্নায় আকুল করে তুলেছিল।

ত্রিপলী যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বল্কান যুদ্ধ' আরম্ভ হল। ফলে ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিল। এখানকার মুসলমানগণ স্বভাবতই মনে করতে লাগল যে খৃস্টান শক্তিসমূহ তুরস্ক তথা মুসলমানদের

ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। এ চেতনা উন্মোষের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের খৃস্টান রাজশক্তির উপর তাদের বিশ্বাস অনেকটা শিথিল হয়ে এল।

ভারতের মুসলমানদের চেতনা, উন্মেষের এই শুভ মুহূর্তে এদেশের বুকেও কতকগুলি ঘটনা ঘটে যায়-যা এদেশের মুসলমানদের জীবন চেতনার মূলে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। প্রথম ঘটনা "কানপুরের মসজিদ সংক্রান্ত"। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে ও অগণিত নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে বৃটিশ রাজশক্তি সেদিন মুসলিম-বিরোধী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছিল। এরই পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার ব্যাপারে। ১৯০৮ সালে রাজনৈতিক কাজের সুবিধার জন্যই বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল তবে এই বিভাগ মুসলমান জনসাধারণের জন্য মঙ্গলময় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯১১ সালে শুধু মাত্র হিন্দুদের প্রতিবাদে যখন বিভক্ত বাংলাকে যুক্ত করে দেওয়া হল, তখন মুসলমানদেরও জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলীত হল।

এই সমস্ত ঘটনা ভারতীয় মুসলমানগণের জীবনে কতখানি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল কবি ইকবালের জীবন থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়। ঐ সালেই তিনি মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই যুগে লিখিত উর্দু কবিতাবলীর মধ্যে 'মজহাব', 'কুফর ও ইসলাম' 'গর্রা এ শওয়াল', 'শুর', 'আএ আফতাব', 'নওয়ীদে সুবহ', 'মুসলিম আউর তালিমী জদীদ', 'শামা আওর শায়ে', খিজর-ই-রাহ', 'তুলুয়ে ইসলাম', 'জওয়ানান-ই-ইসলাম', 'তারানা এ-মিল্লি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেকওয়া ও জওয়াব এ-শেকোয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এই সমস্ত কবিতার বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী একটু মানোযোগ সহকারে লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, এ সময় কবি মুসলিম কবির আসনে উপবিষ্ট। স্বদেশ ও স্বজাতির আশাহীন বিপর্যস্ত জীবনে আশার বাণী শুনিয়ে তিনি জাতিকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। অবশ্যি কবি ইকবালের কাছে স্বদেশ ও স্বজাতি ভারতের ভৌগোলিক সীমায় এবং এদেশের মুসলমানদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশসমূহ ইকবালের স্বদেশ আর তাই বিশ্ব মুসলিম

সমাজ তাঁর স্বজাতি। তিনি নতুন করে উপলব্ধি করলেন ভৌগোলিক সীমারেখায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে জাতিগঠন, কোরানের বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী। তাই দেখা যায় প্রথম যুগের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাবালুতা ত্যাগ করে স্বজাতির উদ্ধারকল্পে তিনি এ সময় খাঁটি মুসলমান কবি বনে গেলেন। তাই–

'সাঁরা জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থাঁ হামারা'র
পরিবর্তে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল––
'চীন আরব হামারা, হিন্দুস্থা হামারা
মুসলিম হ্যায় হাম,
ওয়াতন হ্যায় সারা জাঁহা হামারা'
অর্থাৎ হিন্দুস্থান আমার দেশ, চীন আরবও আমার দেশ
আমি মুসলমান,
সমস্ত পৃথিবীই আমার স্বদেশ।

কবির এই 'তারানা-ই-মিল্লি' মুসলমানদের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল।

কবি ইকবালের এই মানসিক বিবর্তনকে তখনকার অনেকেই স্বাভাবিক-ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, তাঁর এই মনোভাবকে উদ্দেশ্য করেই সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি লিখেছিলেন–

'হিন্দী হোনে পর নায জিসে কাল তক থা হিজাযী বন বৈঠা'।
আপনি মহফিল কা রিন্দ পুরানা আজ নামাযী বন বৈঠা।'

অর্থাৎ—
'কাল পর্যন্ত যাঁহার ভারতীয় হইবার গর্ব ছিল,
তিনি আরবী বনিয়া গেলেন,
আপন সভার পুরাতন পাপী আজি
কি না নামাযী বনিয়া গেলেন।'[১]

---

[১] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুবাদ

ইউরোপ থেকে যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি নিয়ে ইকবাল দেশে ফিরলেন তারই ফলে কবির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হল। সমস্ত প্রকৃতি ও জগৎ তাঁর মনে নতুন অর্থে নব সৌন্দর্যে ধরা দিল। এতে কবি এক অনন্ত জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হলেন। আর সেজন্যই তাঁর এ সময়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই রহস্যঘন দর্শনের কুয়াশায় ভরপুর।

'শেকওয়া' এবং 'জওয়াব -এ শেকওয়া'র পরই কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গেদারা, আসরার-ই-খুদী, রামুজ-ই-বেখোদী, 'পায়ামে মাশরেক, 'জবুরে আজম' ও জাবিদনামা।

বাঙ্গেদারার কবিতাগুলি ছাড়া এ সময়ের সমস্ত রচনাই ফারসীতে লেখা। তার মধ্যে আসরার-ই-খুদী'ই সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রধানত এই কাব্যগ্রন্থ রচনা করেই কবি ইকবাল ইউরোপে পরিচিত হন। ১৯১৪ সালে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় কবি এই কাব্যের কিয়দংশ পাঠ করেন। বইটি প্রকাশিত হয় এর বছর দেড়েক পরে। এরও দুই বৎসর পরে 'রামুয-ই-বেখোদী' প্রকাশিত হয়। আপাত দৃষ্টিতে আসরার ও রামুয দু'টি ভিন্ন কাব্য হলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন নয়, দ্বিতীয় কাব্য প্রথম কাব্যেরই পরিপূরক।

'আসরার-ই-খুদীতে' তিনি ব্যক্তিত্বের জয় ঘোষণা করেছেন আর রামুয-ই-বেখোদীতে' তুলে ধরেছেন জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সমাজ জীবনের কথা। এই গ্রন্থে ইকবাল ইসলামী সমাজ বিধানকে বিশ্বের সর্বোত্তম সমাজ বিধান বলে বার বার ঘোষণা করেছেন।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাই হল ইকবাল দর্শনের মর্মবাণী। ব্যক্তিত্বের অভাব মৃত্যুরই নামান্তর, কবির খুদীবাদের এই হল মূলকথা। এই জন্যই বার বার তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ গড়ে তুলতে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে। ব্যক্তিত্বের এরকম প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের বাণী এশিয়া বা ইউরোপের অন্য দার্শনিক কখনও প্রচার করেননি। জাতিকে তার দুর্জয় ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তুলে জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন করে দেবার সাধনাই ছিল ইকবাল কাব্যের প্রতি পংক্তিতে। তাই 'আসরার-ই-খুদীতে' জাতিকে কবি বার বার আহ্বান জানিয়েছেন নব জীবনের পথে। সে পথ তো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অনন্ত বেদনার দুঃসহ পারাবার পার হতে

পারলে তবেই মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে পারে। ব্যক্তি যতই সংগ্রাম সহিষ্ণুতা ও দুঃখভোগ সহ্য করতে শিখবে 'খুদী' ততই তাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে। তার জন্য প্রয়োজন অসামান্য ত্যাগ ও অনন্ত সাধনা। এই সাধন-পথের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কবি 'আসরার-ই-খুদীতে' ব্যক্তিত্ব বিকাশের তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। প্রথম স্তর আনুগত্যের। এরই ইঙ্গিতে কবি বলেন--

'ওগো মুসলিম ! ওগো বেখেয়াল!
নিয়মের কাছে মাথা নত কর।
স্বাধীনতা সে যে নিয়মেরি সন্তান,
নিয়মের মুঠোয় বন্দি চন্দ্র সূর্য,
গোলাপের খোশবুতে বন্দি বাতাস
কস্তুরী সেও ত বান্দি মৃগনাভির কারাগারে
রক্তের যাতায়াত শিরার বন্দিশালায়
মিলনের নিয়মে বিন্দু থেকে সমুদ্রের সৃষ্টি
কণা থেকে জন্ম সাহারার।
নিয়মের বিরুদ্ধ তুলো না তোমার কণ্ঠস্বর
ওগো বেখেয়াল। ওগো মুসলিম।'

দ্বিতীয়ত আত্মসংযম। এ পথ দুরূহ। জীবন-মরণ, দুঃখ-দৈন্যের ভয়,-- ধনৈশ্বর্য্য, মান সম্মান, খ্যাতি প্রতিপত্তির কামনা, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ভালবাসা প্রভৃতি প্রতি মুহূর্তে মানুষকে টেনে আনতে চায় সংযমের পথ থেকে। কিন্তু অসীম ধৈর্য ও মনোবল নিয়ে সমস্ত বাধা বিঘ্নকে যখন সে অতিক্রম করে তখনই তার জীবনে আসে পূর্ণতা। তখনই সে লাভ করে খোদার প্রতিনিধিত্ব। সাধনা-জয়ী মানুষ তখন —

'(সে) খোদারই জন্য জাগে
খোদার জন্য ঘুমায়।
বৃদ্ধকে সে শোনায় নব যৌবনের গান,
সব কিছুকে ভরে দেয় জীবনের প্রাচুর্যে,
মানুষের জন্য বয়ে আনে সে আনন্দের বাণী,
কখনো বা তাকে করে সাবধান।
জীবনের সে অর্থ খোঁজে,

স্বপ্নকে রাঙায় নতুন রঙে।
জীবন বীণার অশ্রুত সঙ্গীত
তার গোপন সত্তা হয় জীবনের রহস্য।'

এই জন্যই মানুষের খুদীকে দুর্বল করতে পারে এমন সব কাজের জোর প্রতিবাদ করেছেন ইকবাল। নিষ্ক্রিয় ভাবময় জীবন মানুষের মৃত্যুর সমকক্ষ। তাই এই সূফী মতের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে গিয়ে তিনি পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের গজলেরও তীব্র সমালোচনা করেন। একই কারণে প্লে-টোর দর্শনকে তিনি 'দুর্বল ছাগসুলভ' বলে অভিহিত করেছেন। এ সমস্ত মতবাদের অশুভ পরিণতির কথা ইকবাল ছোট্ট একটি গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে গল্পটি উদ্ধৃত করছি।

কোনও এক চারণভূমিতে দীর্ঘদিন ধরে বহু ভেড়া বাস করে আসছিল। ঘটনাক্রমে পাশের জঙ্গলে কয়েকটি বাঘ এসে বাসা বাঁধল। ক্ষুধায় আহারের প্রয়োজন, সুতরাং পাশের চারণভূমির ভেড়া মেরে বাঘগুলি সুখে দিন যাপন করতে লাগল। নিরুপায় ভেড়ার দল আত্মরক্ষার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিল না। এমন সময় এক বৃদ্ধ বুদ্ধিমান ভেড়া বাঁচবার একটি উপায় উদ্ভাবন করল। সে ভাবল ভেড়াকে যখন বাঘে পরিণত করা যাবে না তখন বাঘকেই ভেড়া বানাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ভেড়াটি সাহস করে বাঘের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি খোদার বার্তাবাহক। তোমাদের মঙ্গলের খবর নিয়ে এসেছি।' সাগ্রহে বাঘগুলি সে বার্তা শুনতে চাইল, ভেড়াটি বলল ' যারা শক্তিশালী হয়েও দুর্বল ভেড়ার মতো জীবকে মেরে খায় তার ধ্বংস আসন্ন। যদি চিরজীবী হতে চাও ত ঘাস পাতা খাও আর নিজের শক্তিকে সংহত কর। কারণ দুর্বলরাই শুধু বেহেশতে যাবে।'

ধূর্ত ভেড়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। বাঘের দল ঘাস পাতা খেয়ে বেহেশতের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে তাদের শক্তি অন্তর্হিত হ'ল। তারা ভেড়ার দলে এসে যোগ দিল।

'আকে কার দে গোস্‌ফান্দা শীকার
কারাদ্ দীনে গোস্‌ফান্দাঁ ইখ্‌তোয়ার
আয আল্‌ফে আঁ তেজীয়েঁ দান্দা না-মাঁন্দ্
হ্যায় আত্‌এ চাসম্‌এ সারার্ আফসাঁ না-মান্দ্

আ জনুন্ কোসিসে কামিল্ না-মাঁন্দ্
তীর্ বেদার আয্ ফসুঁ বেস্ খিফত্
ইন্ হেতাতে খেস্ রা তাহ্জীব্ গুফত্।'

অর্থাৎ—
'যারা শিকার করত মেষ
এবার গ্রহণ করল মেষের ধর্ম
তৃণ ভোজন ভোতা করে দিল তাদের দন্ত,
নির্বাপিত করল তাদের চোখের ঔজ্জ্বল্য।
থাকল না তাদের অতি পরিশ্রমের প্রমত্ততা,
কর্মের আকাঙ্খা আর থাকল না তাদের অন্তরে।
জাগ্রত ব্যঘ্র মেষের যাদুতে হোল তন্দ্রাভিভূত,
এই অধঃপতনেরই নাম করলো সে নৈতিক শিক্ষা।

১৯২৪ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক নিকলসন (A.R. Nicholson) Secrets of Self নাম দিয়ে বিখ্যাত কাব্য আসরার-ই-খুদী'র অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় 'খিযর রাহ' (অমৃতের উৎস পথ), এবং ১৯২২ সালে 'তুলুয়ে ইসলাম' (ইসলামের অভ্যুত্থান)। আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় কবি ইকবাল এই খণ্ড কবিতা পাঠ করেন এবং পরে 'বাঙ্গেদারা' বার্ষিক সভায় কবি ইকবাল এই খণ্ড কবিতা পাঠ করেন এবং পরে 'বাঙ্গেদারা' কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থে সংযোজিত করেন।

১৯২৩ সালে প্রকপাশিত হয় 'পায়ামে মাশরেক' বা প্রাচ্যের বাণী। ফারসীতে রচিত এই খণ্ড কাব্য জার্মানীর দার্শনিক কবি গেটের West Ostlicher Divan- এর প্রত্যুত্তর স্বরূপ। শতাব্দী পূর্বে কবি গেটে প্রাচ্যকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন -শতবর্ষ পরে প্রাচ্যের দার্শনিক কবি ইকবাল সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। কবি নিপুণ চিত্রকরের মতো ইউরোপের প্রতিকৃতি একেছেন এই কাব্যে এবং তৎপ্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই কাব্য সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন—

"The Western Sage the German Poet
Who was attracted by Persian ways
Described charming beauties of that land,
And rendered East homage to the West,
In response I have composed Message of the East,
In it I have radiated light on East's even tide."

পাশ্চাত্য মনীষী আইনষ্টাইন ও বার্গসঁর আদর্শ সামনে রেখে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের নব সৃষ্টির আয়োজনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করেন পায়াম। তাই তিনি বলেন----

A wild wave rolled fast and said,
'I am' If I move, if I don't 'I am not.'

এর পর 'যবুরে আজম'। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত এই কাব্যটির ভাষা ও ফারসী। বইটি তরুণ সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রাচ্যের মানুষকে কবি এ গ্রন্থে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন ব্যক্তি, প্রকৃতি ও আল্লাহতায়ালার রহস্যের অনুসন্ধান করতে।

'জাবিদনামা' কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। এটিও ফারসীতে রচিত। প্রকাশ কাল ১৯৩৪। দান্তের ডিভাইন কমোডিয়ার' আদর্শে রচিত এই কাব্যে কবি আকাশ ভ্রমণের বর্ণনা করেছেন সুললিত ছন্দে। মনে হয় এ কাব্যে ইকবালের কাব্য প্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। গ্রন্থশেষে কবি আপন কনিষ্ঠ পুত্র জাবিদকে দাঁড় করিয়েছেন তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে; এবং পুত্রকে উদ্দেশ্য করে সমগ্র তরুণ সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন এক মহৎ জীবনের আদর্শ। কবি নিজেই মৃত্যুর পূর্বে এ সম্বন্ধে জাবেদ ইকবালকে বলে যান-'জাবিদনামা'র শেষাংশ তোমারই জন্য রচিত। বর্তমান যুগে পৃথিবীতে সৎ লোকের অভাব দেখা যায় এবং খোদাপ্রেমিক লোক পাওয়া দুষ্কর। সৌভাগ্যক্রমে, কোন ধার্মিক লোকের সংসর্গ লাভ করলে তো কথাই নেই। তা না হলে আমার উপদেশাবলির অনুসরণ করে চলো।'

'জাবিদনামার' পর এই যুগে কবি আরো ক'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন 'বালে জিবরিল' (স্বর্গীয়দূতের জন্যে),'জরবে কলীম' (মূসার যষ্টির আঘাত) উভয় গ্রন্থই উর্দু কবিতার সংগ্রহ।

'বাঙ্গেদারাতে' প্রথম থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত রচিত উর্দূ কবিতাসমূহ কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত করে ১৯২৪ সালে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী যুগের কাব্যসমূহ ফারসীতে লেখা। কিন্তু এ সময় তিনি উর্দু কবিতাও কিছু রচনা করেন। 'বাঙ্গেদারার' পরে রচিত উর্দু কবিতাসমূহ এই দুই গ্রন্থে সংগ্রহীত হয়েছে।

'বালে জিবরিল' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। বাঙ্গেদারার' বহুদিন পরে এই উর্দু কাব্য গ্রন্থ হাতে পেয়ে উর্দু পাঠকদের মনে নতুন আশা জাগল। তারা বুঝতে পারল ইকবাল ফারসী ভাষার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাননি। 'বালে জিবরিল' উর্দু কাব্য সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। এর অধিকাংশ কবিতা ইংল্যাণ্ড, স্পেন এবং প্যালেস্টাইনে বসে রচিত। এর মাঝে সর্বহারাদের বেদনা গ্রথিত হয়েছে। এর পরে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় 'জরবে কলীম'। এটিও উর্দু গ্রন্থ। বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত কবিতার মাধ্যমে কবি বর্তমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। এতে বালে জিবরিলের বক্তব্য বিষয়গুলিকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে এই গ্রন্থকে বালে জিবরিলের পরিশিষ্টও বলা হয়।

বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি ইকবালের সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। ইকবাল দর্শন ও ইকবালের ইসলাম মনকে জানবার প্রয়োজনে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু অনুধাবন একান্ত দরকার। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর গ্রন্থসমূহের একটা মোটামুটি আলোচনা করা হল। ইকবালকে পূর্ণভাবে জানতে হলে তাঁর মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করতে হবে। ইকবালের অপরাপর রচনাবলীর পরিচয় গ্রন্থ শেষে দেওয়া হয়েছে।

কবি প্রেরণার উৎস

কবি ইকবালের কাব্য-জীবন আলোচনার প্রাককালে প্রসিদ্ধ ইটালীয় দার্শনিক ক্রোচের মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাব্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কোন দেশে বা কোন কালে মানবজাতির সুপারিশের উপর নির্ভর করে কেউ কখনও কবি হতে পারেনি। যিনি প্রকৃত কবি, তাঁর সৃষ্টিই কবি, তাঁর সুপারিশের পত্র। একথা দান্তে এবং সেক্সপীয়র সম্বন্ধে যেমন সত্য ইকবাল সম্বন্ধেও তেমনি প্রয়োজ্য। প্রকৃতপক্ষে কবি প্রতিভা সমস্ত যুক্তি তর্কের উর্ধ্বে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো কাব্যশক্তি কবি হৃদয়ের নিভৃততম প্রকোষ্ঠ থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বেরিয়ে এসে কাব্য জগৎকে করে তোলে সমৃদ্ধ। কবি ইকবালের প্রতিভাও যে এর ব্যতিক্রম পথে চলেনি তা সহজেই অনুমেয়।

ইকবালের কাব্যধারা অনুশীলন করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে একটি যুগ্মধারা প্রবাহিত হয়েছে তাঁর সমস্ত কাব্যের মধ্যে। প্রথমত মানব মর্যাদার শ্রেষ্ঠতম স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয়ত মানবের বিপুল সম্ভাবনার প্রচণ্ড আশা। এই দুটি মূলভাবকে সামনে রেখেই তিনি বলেছেন–

'খুদী কো কার বুলান্দ ইতনা কে হার তাকদীর সে পহলে
খোদা বান্দেসে খোদ পুছে বাতা তেরী রিযা কিয়া হ্যায়?

'তোমার আত্মশক্তিকে এমনই উচ্চে তোল , প্রত্যেক ভাগ্য লেখার আগে খোদা যেন জানতে চান, 'হে বান্দা তোমার অভিলাষ কি?' আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি মানুষকে উদ্যোগী ও কর্মব্যস্ত করে তুলতে তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতে কষাঘাত করেছেন।

আধুনিক যুগোপযুগী উচ্চতম শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। ভারত উপমহাদেশে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত কবি। তাছাড়া নিজের জ্ঞান গরীমায় স্বদেশের ও বিদেশের সম্মান এবং যশ লাভ করার সৌভাগ্যও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর একান্ত ব্যক্তি জীবনে এসবের প্রভাব বড় বেশী দেখা যায় না। সেখানে আল্লামা ইকবাল একজন মুক্ত-পুরুষ-সত্যিকারের দরবেশ।

সংসারে থেকেও তিনি সংসার বিরাগী-ফকিরের জীবন যাপন করেছেন। এ দরবেশী বা ত্যাগের দীক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পিতা শেখ নূর মুহম্মদের জীবন থেকে। সে সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচালিত আছে।

ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহম্মদ এক সূফী পীরের মুরিদ ছিলেন। পীরের নির্দেশে তিনি বহু কর্মহীন দিবস এবং নিদ্রাহীন রজনী নির্জন সাধনায় অতিবাহিত করেন। সে সব আধ্যাত্মিক ভাবের বীজ শিশু ইকবালের অন্তরেও উপ্ত হোক এই ছিল নিরাসক্ত পিতৃমনের একান্ত কামনা। এগারো বৎসরের বালক ইকবালের অপরিণত চঞ্চল মন যদিও সে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবধারা ধারণের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না, তথাপি পিতার গোপন বাসনা ব্যর্থ হয়নি। শেখ নূর মুহম্মদের ত্যাগ ও সাধনা অলক্ষে তাঁর পুত্রের উপর যে রেখাপাত করেছিল তারই প্রভাবে যে ইকবালের ভাবী মন গড়ে উঠেছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তিনি যে এত বড় একজন দার্শনিক ও সূফী হয়ে উঠেছিলেন, উত্তর জীবনে তাঁর চরিত্রে যে ত্যাগের মোহনীয়তা দেখা দিয়েছিল এ সব তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন বলেই অনেকের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে ইকবালের বাল্যজীবনের উল্লিখিত গল্পটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

এক রাত্রে কিসের আওয়াজে ঘুম ভেঙে ইকবাল দেখতে পেলেন তাঁর মা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে-গেলেন। মাতাকে অনুসরণ করে নীচে নেমে এলেন ইকবাল। সামনেই একটা দরওয়াজা, তার একাংশ খোলা। সেই খোলাপথে এক ঝলক আলো এসে ঘরটাকে আলোকিত করে তুলেছিল। ইকবাল মায়ের সাথে সাথে সেই দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন।

মায়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে ইকবালেরও দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বাইরে যেখানে উন্মুক্ত স্থানে আত্মস্থ হয়ে বসে আছেন তাঁর পিতা শেখ নূর মুহম্মদ আর তাঁর চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে এক ঝলক আলো। বালক ইকবাল আগ্রহে ছুটে যেতে চাইলেন সে আলোর দিকে। মা বাধা দিলেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বহু কষ্টে সেদিন ইকবালকে উপরে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বালকের মনে অসীম জিজ্ঞাসা। তাই প্রত্যূষে উঠেই তিনি ছুটে গেলেন পিতার কাছে। মা তার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। ইকবাল শুনতে পেলেন মাকে বলা তাঁর পিতার কাহিনী–

কাবুল থেকে একদল যাত্রী এ শহরের দিকেই আসার পথে ভয়ানক সঙ্কটে পড়ে বাধ্য হয় শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে আস্তানা গাড়তে। যাত্রীদলে একজন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত, যার জন্য তাঁরা অগ্রসর হতে পারছে না। তাঁর আরোগ্যের জন্য আমাকে সেখানে যেতে হবে।

কিছু খাবার ও ঔষধাদি নিয়ে ইকবালের পিতা তখনই রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইকবালও তাঁর সঙ্গ নিলেন। পথে যেতে যেতে ইকবাল অনুভব করলেন অতি দ্রুত যাত্রীদলে পৌছার জন্য তাঁর পিতার অসীম অস্থিরতা। ভাগ্যক্রমে টাঙ্গা তাঁদের আশাতীত দ্রুত গতিতেই পৌছে দিল গন্তব্যস্থানে। রুগ্ন ব্যাক্তি ঐশ্বর্যশালী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। সমস্ত কাফেলা তাই ম্রিয়মাণ। অসুস্থতার জন্যই তাঁকে নিয়ে চলেছিল শহরে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য। মাঝপথে এই বিপদ--রোগী মুমূর্ষু। এসম্বন্ধে ইকবাল বলেন, 'আমরা কাফেলার নিকট উপস্থিত হলাম। পিতা দ্রুত দলপতির কাছে গিয়ে রুগ্ন ব্যক্তির দর্শনপ্রার্থী হয়ে সত্বর তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার প্রার্থনা জানালেন। দলপতির মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তথাপি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গেই তাঁকে মুমূর্ষুর শয্যাপাশে নিয়ে গেলেন। অথচ কি করে এর রোগ সংবাদ তাঁর কাছে পৌছেছিল তা জিজ্ঞেস করার সাহসও যেন সেই বিস্ময়ের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল।'

ইকবালের পিতা রুগ্ন ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন মারাত্মক ব্যাধিতে তার দেহের অনেকাংশ একেবারে পচে গেছে। তিনি ছাইয়ের মত কি একটা জিনিস সে সব ক্ষতস্থানের উপর ছড়িয়ে দিলেন। রোগীর পরিচর্যা সমাপ্ত করে কাফেলাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'আশা করি অবিলম্বেই রোগী সেরে উঠবেন। তবে তাঁর শরীরের যে সব অংশ পচে নষ্ট হয়েছে তা পূরণ করার শক্তি একমাত্র খোদাতায়ালার হাতে।'

অতি অল্পকালের মধ্যে সেই দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে আশাতীতভাবে সে ব্যক্তিকে মুক্ত হতে দেখে আত্মীয় পরিজনদের আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রইল না। মনে হয় সেদিন শুধু নিঃস্বার্থ কামনা এবং গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই ইকবালের পিতা ঐরকম দুরারোগ্য ব্যাধির মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই ঘটনাটি ইকবালের শিশু মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আর তখন থেকেই অসীম শ্রদ্ধার সনে পিতার মানব কল্যাণকামী মনের সান্নিধ্য পাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত পিতার মরমী পরশ পেয়ে ইকবাল ধন্য করে তুলেছিলেন তাঁর জীবন ও জগৎকে।

এই পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে ইকবালের জীবন, রূপলাভ করেছে তাঁর ভবিষ্যত কাব্য, সূফীবাদ ও দর্শন।

আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং আত্মার উন্নতিই ইকবালের জীবন দর্শনের প্রথম সবক।

নিপীড়িত মানবতার কল্যাণ সাধনায়ও তিনি অতিবাহিত করেছেন বহু রজনী।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু দার্শনিকের মতবাদ সমন্বয় লাভ করেছে তাঁর দর্শনে।

"He combined in his personality the East and West, like the confluence of two streams. The breadth the profoundity of his verse are due to his masterly assimilation of both eastrn and western literature and philosophy."[১]

এইদিক থেকে ইকবালকে প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য দর্শনে যোগসূত্রকার বলা যেতে পারে।

এই সমন্বয় প্রচেষ্টার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল ইকবালের লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে অধ্যাপনা কালে। কারণ এই সময়ই ইকবালের বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিধ পণ্ডিত আরনল্ডের সাহচর্য্য ও বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্য হয়। মীর হাসানের প্রভাবে যেমন ইকবালের মনের অঙ্কুরিত সূফিবাদ বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি টমাস আরনল্ডের সাহচর্য্যে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মহৎ দিকটার সঙ্গে পরিচিত হন। বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্ব উদঘাটন ও তথ্য বিশ্লেষণ করে ইকবাল তাঁর দর্শনের ভিত্তিভূমি স্থাপন করেছিলেন ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদের উপর। এই জন্যই তিনি একজন প্রকৃত মুসলমান কবি বলে অভিহিত।

---

[১] A short history of Hind-pakistan-pakistan History Board. page 403

'এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট এবং কোরান হাদিসের একনিষ্ঠ অনুসারী কবি ইকবাল ইসলাম ধর্মীয় চিন্তাধারাকে নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করলেন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাবলী Reconstruction of Religious thought in Islam-এ। এসব বক্তৃতাবলীর আসল উদ্দেশ্য ছিলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তা-ভাবনার আলোকে ইসলামী শিক্ষাধারা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা ও সংস্কার করা। তিনিই প্রথমে ঘোষণা করলেন যে, ইসলাম কখনও ধর্ম বা বিজ্ঞানের মধ্যে সীমারেখা টানে নাই– প্রকৃত সত্য এই যে ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন পথে চালিত হলেও তাঁদের লক্ষ্য একই। ইকবাল ক্লাসিকেল ইসলামকে যুগোপযুগী ছাঁচে ঢালবার প্রকৃষ্ট হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেন ইজতেহাদকে। ইজতেহাদের নিরংকুশ অধিকারকে স্বীকার করে 'জাবিদনামায়' তিনি ইসলামের এইরূপই এঁকে গেছেন—

নতুন পাতায় তার ব্যবস্থা ভরে যাবে,
শ্বাশ্বত হয়ে নব নব রূপে রূপায়িত হবে,
বাহিরের পরিবর্তনে তার ভিতরের রূপ বদলাবে না–
কেবল বাহিরটাই বারে বারে নতুন রূপ ধারণ করবে।[১]

এই জন্যই দেখতে পাওয়া যায় ইসলামের অপূর্ব শিক্ষা ও সৌন্দর্য ইকবাল নতুনভাবে নতুন রূপে কীর্তিত করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যে।

এই জীবনবাদী, ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী কবি কিন্তু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারেননি হিন্দু দর্শনের মায়াবাদের বা বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণবাদের প্রতি।

তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আসরার-ই-খুদী' ও রামুয-ই বেখোদী' দু'খানি গ্রন্থকে পরস্পর যুক্ত বলা যেতে পারে। 'আসরার-ই-খুদী'তে রয়েছে ব্যক্তিগত জীবন বিকাশের নির্দেশ, আর 'রামুয-ই-বেখোদীতে' রয়েছে সমষ্টিগত জীবনধারা।

ইকবালের মতে প্রতিটি মানুষ আপন অস্তিত্বে এক একটি ব্যক্তিসত্তা। আরও খোদা আপন অস্তিত্বে এক মহা মহীয়ান। মানুষ আপন খুদী বা ব্যক্তিত্বের বিকাশে খোদার অস্তিত্বে মিশে যেতে পারে না সত্য কিন্তু খোদার গুণে গুণান্বিত হওয়ার শক্তিতে সে শক্তিমান।

---

[১] মুসলিম মনীসা–আবদুল মওদুদ! পৃ ২০৪

দার্শনিক ইকবালের কাছে মানুষের জীবনই সত্য। অন্য সব প্রহেলিকা, সব মরীচিকা। জড়বাদীদের মত শুধু জীবনের ব্যর্থতাই ইকবাল দর্শনের মূলমন্ত্র নয়। তাঁর মতে ব্যথা বেদনা ও পরাজয়ের সাথে রয়েছে বিজয়ের আনন্দ। জীবন পথে কোমল কঠোর দুয়েরই সাক্ষাৎ মিলতে পারে। সত্যিকারের মানুষ করবে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা। মানুষের কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শই তাই। জাগতিক বস্তুর সাথে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সমন্বয় সাধন তাঁর দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অদৃষ্টবাদীদের যুক্তি খন্ডন করে দার্শনিক ইকবাল বলেছেন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তিতে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই আসরার-ই-খুদী গ্রন্থে তিনি প্লেটোনিক দর্শনকে অস্বীকার করেছেন। কারণ প্লেটোর শিক্ষা মানুষের উদ্যমশীল জীবনকে চিন্তাশ্রয়ী, নিষ্ক্রিয় অদৃষ্টবাদের দিকে ঠেলে দিয়ে গতিশীল দর্শনের পথ থেকে বিচ্যুত করে। তিনি মানুষকে সব রকম দুর্বলতা নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ দুর্বলতাই মানবজীবনের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে মানুষের জীবনকে অহেতুক ভয় ও আত্মপ্রবঞ্চনায় ভরে তোলে। এ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশেই কবি বলেছেন–

'তোমার কাঁচা অধোগামী সত্তার জন্যই তুমি ঘৃণিত অপমানিত, তোমার নরম শরীর ও আরামপ্রিয়তাই তোমাকে পুড়িয়ে মারছে। মিথ্যা ভয়, দুঃখ ও সন্দেহ পরিত্যাগ করো–

পাথরের মত কঠিন ও হীরার মত দামী হও,
তার দ্বরাই ইহলোক পরলোক আলোকিত হয়,
যে জন কঠোর কর্মী ও কৃচ্ছ্রসাধক হয়।
জীবনের সম্মান দৃঢ়তাতেই নিহিত-
দুর্বলতাই তো তুচ্ছতা ও অপরিপক্কতা।'

এই মত সমর্থন করতে গিয়ে কবি ইকবাল বলেছেন---

To my mind nothing is more alive to the Quranic outlook than the idea that the universe is the temporal working out of a preconceived plan. অপরাপর দার্শনিকদের মতের বিরোধীতা করে ইকবাল আরও বলেছেন, 'মানুষের আত্মার বিকাশ নির্ভর করে খোদা বিশ্বাসের উপর।' 'Since God is

the ultimate spiritual basis of life, loyalty to God virtually amounts to man's loyalty to his own ideal nature.'

আপন ধর্মমত , খোদায় বিশ্বাস, দরবেশী সূফীবাদ এবং সর্বোপরি কাব্য ও দর্শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের মধ্যে ইকবাল ছিলেন স্বকীয় বৈশিষ্টে একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কাব্য দর্শন ও সূফীবাদ ছিল একই আলোকবর্তিকার দুটি। সে আলোকবর্তিকার মূলে ছিল তাঁর স্নেহময় পিতার নসিহত এবং সুযোগ্য ওস্তাদ মীর হাসান সাহেবের শিক্ষা। ইকবাল বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে এই ওস্তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর গভীর ভক্তি শ্রদ্ধার নিবেদন স্বরূপ লিখে যান–

'ওহ সম' এ বারগহে খান্দানে মুর্তবভী,
রহেগা মিস্‌লে হিরম জিসকা আস্তা মুঝকো।
নফ্‌সসে জিস্‌কে খুলী মেরী আরযুকী কলী,
বানায়া জিস্‌কী মর্‌ও ওৎনে নুক্তাদাঁর সমুঝকে।
দু'আয়িহ্ করা কি খুদাওয়ান্দে আস্‌মানো যমী
করে ফির্ উস্‌কি যিয়ারৎ সে শাদমাঁ মুঝকো।'

অর্থ–
'তিনি হযরত আলীর উচ্চ বংশের প্রদীপ,
যাঁহার দ্বারদেশ কাবা গৃহের ন্যায় পবিত্র রহিবে
নিকটে আমার
যাঁহার নিঃশ্বাসে ফুটিয়াছে আমার আশার কলি,
যাঁহার মনুষ্যত্ব মর্মজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে আমায়।
এই প্রার্থনা কর যেন স্বর্গ মর্তের প্রভু,
পুনরায় তাঁহার দর্শন দ্বারা করেন আমায় আনন্দময়।'[১]
সুযোগ্য ওস্তাদের উপযুক্ত শিষ্যই বলতে হবে।

[১] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুবাদ হতে।

আধুনিক শিক্ষা ও ধর্ম

আল্লামা স্যার মুহম্মদ ইকবাল সমগ্র মুসলিম জগৎ এবং বিশেষ করে ভারতের মুসলমানদের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মানসিক অশান্তির অবধি ছিল না। ইউরোপ যাত্রার সময় ইসলামভূমির অধঃপতন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই সেদিন পুণ্যভূমি আরবের দুর্দশায় কবির চোখে অশ্রু উদগত হয়ে উঠেছিল। অশ্রুসজল কবি কণ্ঠ মুখর হয়ে তাই সেদিন ইসলামের প্রাচীন সভ্যতাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠেছিলন :

'এক সময় তুমি ছিলে সভ্যতার আদিভূমি।
তোমার দৃষ্টির আগুনে জ্বলে উঠত দুনিয়ার সৌন্দর্য্য।
তোমার ধ্বংসের গান আজ আমায় গাতে হচ্ছে,
এ যন্ত্রণা সইতে হবে আমাকে অন্যকেও দিতে হবে।
তোমার ধ্বংসের বুকে কি কথা লুকান আছে?
তোমার নীরবতাও আজ যেন মুখর হয়েছে।'

ইকবাল শুধু মুসলমান পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেননি, তিনি ছিলেন মনে প্রাণে ইসলামের ভাবধারার ধারক ও বাহক। তাই তিনি যখন দেখতে পেলেন শিক্ষা, অর্থ, নৈতিকচরিত্র ইত্যাদি সব দিকেই পিছিয়ে আছে মুসলিম সমাজ, তখন তাঁর হৃদয় ভরে উঠল সীমাহীন বেদনায়। তিনি অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন মুসলমানদের এই অধঃপতনের বীজ কোথায় নিহিত রয়েছে। বেশীদিন সময় লাগল না, তিনি বুঝতে পারলেন আমাদের এই অধঃপতনের মূল রয়েছে আমাদেরই সমাজ জীবনে এবং মনোজগতে।

ইসলাম-বিরোধী ভাবধারায় প্লাবিত সমাজে প্রবেশ করেছে স্বৈরনীতি, বংশগত পার্থক্য প্রভৃতি। মুসলমান আজ নামেমাত্র মুসলমান। সত্যিকারের মুসলমানের অকৃত্রিম ধর্ম-বিশ্বগ্রাসী শক্তির মূল উৎস একতা ও সাম্য মুসলমানেরা হারিয়ে বসেছে। এ জন্যই মুসলমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। এছাড়াও

দেখা যায় সূফীবাদের সঙ্গে গ্রীক, পারসিক, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান সন্ন্যাস চিন্ত াধারা এসে যুক্ত হওয়ার ফলে ইসলামের কর্ম প্রবণতা লোপ পেয়ে সেখানে স্থান নিয়েছে অলসতা, কর্মবিমুখতা এবং অদৃষ্টবাদ।

অধঃপতিত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নতুন প্রেরণা সঞ্চার এবং জীর্ণ প্রাচীনতার ভেরত শক্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞ নবজাগরণের কবি ইকবাল বুঝতে পারলেন প্রকৃত ইসলামের সরল শাশ্বত শিক্ষাই এই অধঃপতিত সমাজকে মুক্তি দিতে পারে। তাই তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ কাব্যে প্রচার করলেন, 'হে মুসলমান, তোমার সর্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করছে তোমর প্রকৃত মুসলমান হওয়ার উপর।'

'সবক ফির পড় আদালৎকা সুজা আৎকা সদাকৎ কা,
লিয়া জায়েগা তুফছে কাম দুনয়াকী ইমামৎকা'
(হে মুসলমান), আর তুমি ন্যায়, সাহস ও সততার অনুশীলন কর
তোমার দ্বারা জগতে নেতুত্বের কাজ সাধিত হবে।
মুমিন আয আযম ও তওক্কুল কাহির আস্ত,
গর ন দারদ ঈ দো জওহর কাফির আস্ত,
অর্থ– দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নির্ভরশীলতার জন্যই মুসলমান বিজয়ী।
এই দুই গুণের অভাব ঘটলে সে কাফের।

দেশ বিদেশে স্যার ইকবাল

ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ১৯২৮ সালে স্যার ইকবাল মাদ্রাজের মুসলিম এডুকেশনাল এসোসিয়েসান অব সাদার্ণ ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হন। ডিসেম্বরের শেষেভাগে তিনি মাদ্রাজে পৌছোন। এখানে মুসলিম দর্শন সম্বন্ধে যে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে সেই বক্তৃতাই Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে প্রকাশিত হয় এবং সর্বত্র সমাদৃত হয়।

আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দু এবং হিন্দীর তরফ থেকে চারটি সভা হয়। এই চারটি সভায় ইকবাল পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দান করে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে যখন তিনি বাঙ্গালোর গিয়ে পৌছান, তখন বিপুল জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। তাঁর সম্মানার্থে মুসলিম লাইব্রেরী এক মহতী সভার আয়োজন করে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহীশূরের দেওয়ান স্যার মীর্যা ইসমাইল এবং দ্বিতীয় সভার সভাপতি ছিলেন মহীশূরে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শিবনারায়ণ। মহীশূরের মহারাজের নিমন্ত্রণেও এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক হিন্দু অধ্যাপক বলেছিলেন, 'ডক্টর স্যার মুহম্মদ ইকবালকে মুসলমানগণ লক্ষবার তাদের বলুক কিন্তু তিনি আমাদের সকলের। তিনি কোন জাতি বা গোষ্ঠীর হতে পারেন না। যদি মুসলমানগণ এ বলে গর্ব করে যে ইকবাল তাঁদের সহধর্মী তবে আমাদেরও গর্বের কারণ এই যে ইকবাল ভারতবাসী।'

এ ভ্রমণকালেই ইকবাল মহীশূরের হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের কবর জিয়ারত করেন। যখন তিনি টিপু সুলতানের কবরের পাশে গিয়ে উপস্থিত হন তখন মহীশূরের এক কবি দেশপ্রেমিক সুলতান টিপুর প্রশংসামূলক এক কবিতা পাঠ করে তাকে মুগ্ধ করেন। ঐ কবিতা পাঠকালে কবি ইকবাল এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে দেশপ্রেমিক সুলতানের সুদীর্ঘ কাহিনী শুনতে শুনতে তিনি অশ্রু-বর্ষণ করছিলেন।

এ ভ্রমণ সম্বন্ধে আল্লামা ইকবাল বলেন, মহীশূরের যেখানেই আমি গিয়েছি সেখানেই লোকের মুখে মুখে শুনেছি একটি নাম 'সুলতান টিপু সুলতান, যেখানেই দু'তিনজন লোক একত্র মিলিত হয়ে একটি সভা জমিয়েছে সেখানেই শুনেছি এই দেশপ্রেমিক সুলতানের একটি গল্প-একটি রঙীন কাহিনী। একজন বলে চলেছে পরম আবেগের অন্যের মাথা নত করে শুনছে সে বীর সুলতান টিপুর শৌর্য বীর্য ও যুদ্ধের কথা। বাজারে, দোকানে, মহীশূরের পথে-ঘাটে সর্বত্র ঐ একই কথা। ইকবাল আরও বলেন, এ রকম দু'তিন মজলিসে উপস্থিত হয়ে আমি ইচ্ছাপূর্বক কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রতি কথার শেষেই টিপু সুলতান এসে দেখা দিয়েছে।

নিজামের আমন্ত্রণে ইকবাল যখন হায়দারাবাদ পৌছোন তখন পথের পাশে দণ্ডায়মান সারিবদ্ধ বালকদের মিলিত কণ্ঠে ছিল ইকবালেরই জাতীয় সঙ্গীত বা কাওমী তারানা।

১৯৩২ সালে মরহুম ডাক্তার মুখতার আহমদ আনছারীর আমন্ত্রণ কবুল করে তুরস্কের গাজী রফিবে দিল্লী আগমন করেন। তিনি দিল্লীর জামিয়ায়ে মিল্লিয়া বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। এর একটি বক্তৃতা-সভায় স্যার ইকবাল সভাপতিত্ব করেন। আল্লামা ইকবাল দিল্লীতে ডাক্তার আনছারীর মেহমান ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা রফিবে সহ তিনি জামেয়ায় উপস্থিত হলে প্রবেশ পথে রফিবে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ইকবালকে সম্মান জানাবার উদ্দেশ্যেই আগে যেতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, আপনি আমাদের নেতা আপনিই আগে প্রবেশ করুন। পরের দিনের বক্তৃতার পর কবি ইকবাল সভাপতির ভাষণে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দান করেন। সে দিনের বক্তৃতা-সভায় কবি ইকবাল একটি সুন্দর ছোট্ট গল্প বলে বসে পড়লেন। গল্পটি এ রকম, 'মহাযুদ্ধের সময় ইবলিসের কতিপয় শিষ্য তার সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখল ইবলিস একা বসে চুরুট টানছে। শিষ্যরা তার এমন বেকার-ভাবে বসেন থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে ইবলিস বলল, এখন আমার শুধু অবসরই অবসর, কারণ আমার সকল কাজের ভার আমি বৃটিশ মন্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হানাহানির প্রতি তীব্র ঘৃণাই অনুরণিত হয়ে উঠেছে উপরোক্ত গল্পটিতে।

এর কিছুকাল পর কবি ইকবাল পুনরায় দিল্লীর জামিয়ায় আমন্ত্রিত হয়ে যান। সেবারে তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'লণ্ডন থেকে কর্ডোভা পর্যন্ত'। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক মৌলানা আসলাম জিরাজপুরী বক্তৃতায় বলেন, 'আমি আরবী, ফার্সী এবং উর্দু কবিদের বহু লেখা পড়েছি। তবে উর্দু লেখকদের সম্বন্ধে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে আল্লামা ইকবাল ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।'

তার কবিতায় ইসলামের সমস্ত বৈশিষ্ট বিদ্যমান, তাছাড়া তিনিই একমাত্র কবি যিনি যুবসমাজকে সঠিক পথে চলার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায়ও তিনি তাঁর কাব্যে মুসলমানদের গৌরবপূর্ণ অতীত যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে তরুণদের মনে পয়গম্বরপ্রীতি দেখা দিয়েছে এবং কোরানের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।

জামিয়ার বক্তৃতার শেষে আল্লামা ইকবাল প্যারিসে ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বিজ্ঞ দার্শনিক বার্গসঁর সাথে আলাপের উল্লেখ করে বলেন যে, আলোচনা কালে তিনি বার্গসঁকে প্রাচ্যের বহু দার্শনিক মতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন যে সম্বন্ধে এতদিন তিনি অন্ধকারে ছিলেন।

বাদশাহ গাজী নাদির শাহের দাওয়াত কবুল করে ইকবাল ১৯৩৩ সালে আফগানিস্তানে যান। তাঁর সাথে ছিলেন আলীগড়ের প্রসিদ্ধ স্যার রস-মসউদ এবং প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা সুলেমান নদভী। পেশোয়ারের পথে অক্টোবরের শেষাশেষি এরা কাবুল গিয়ে পৌঁছোন।

আফগান বাদশাহের সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে এদের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁদের পরামর্শমতে আফগান সরকার দেশের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার সাধন করেন। আঞ্জুমানে আদবীয়ে কাবুল সাহিত্য সভায় আহুত হয়ে ইকবাল সেখানেও বক্তৃতা দান করেন। আফগানিস্তান থেকে ফেরার পথে ইকবাল গজনী এবং কান্দাহার গমন করেন। গজনীতে মাজারসমুহ জিয়ারত করেন এবং ভাঙা ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহ দেখেন। সুলতান মাহমুদ গজনী, কবি হাকিম সানায়ী এবং আতাগঞ্জ বখশের পিতার কবর দর্শন করেন।

এর পর যান তিনি কান্দাহার। সেখানে খেরকা শরীফে গিয়ে সেখানের সূফী দরবেশদের রুহের প্রতি তাযিম পেশ করে তিনি আপন চিত্তের শান্তি লাভ করেন। কবি ইকবালের মস্‌নবী কাব্যের মুসাফের কবিতাটি এ সময়কার ঘটনাবলীকে উল্লেখ করে লেখা।

সম্মান ও সংবর্ধনা

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক নিকলসন (A.R.Nicholson) ইকবাললের ফারসি গ্রন্থ আসরারে খুদীর কিয়দংশ Secrets of Self. নাম দিয়ে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং ১৯২০ সালে ইংরেজী ভূমিকা সহ এই অনুদিত গ্রন্থ প্রকাশ করে ইকবাল-দর্শনের সঙ্গে ইউরোপবাসীর পরিচয় করিয়ে দেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই পাশ্চাত্য দেশে ইকবালের খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ সালে ইকবালকে নাইট অর্থাৎ স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি গ্রহণের ব্যাপারেও ইকবালের মধ্যে চরম গুরুভক্তির লক্ষণ দেখা যায়। তাঁকে নাইট উপাধি দানের প্রস্তাব পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে তিনি এক শর্ত জানালেন যে তাঁর ওস্তাদ আল্লামা মীর হাসান সাহেবকে সামসুল উলামা উপাধি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি স্যার উপাধি গ্রহণে রাজী নন। ব্রিটিশ সরকার সে শর্ত মেনে নিয়ে গুরু শিষ্য উভয়কেই উপাধিতে ভূষিত করলেন।

এদেশে প্রচলিত ধারণা এই যে, সরকারের তোষামোদকারী না হলে সরকারী খেতাব পাওয়া যায় না। যারা সরকারের লেজ ধরে নাচে তারাই সরকারী খেতাব পেয়ে থাকে। ইকবাল কিন্তু এর ব্যতিক্রম। তাঁর মতো লোকের পক্ষে এ খেতাব পাওয়া অতীব আশ্চর্যের ব্যাপার। কেননা তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী, গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও শ্রমিকদের বন্ধু। এর উপরে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার অগ্রপথিক এবং বিপ্লবের পতাকাবাহী। ইকবাল নির্লিপ্তভাবেই এ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর লেখা বা ভাবধারা কিংবা কার্যপ্রণালী, তাঁর জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

খেতাব লাভের পর কেউ কেউ তাঁর এই সরকারী উপাধি গ্রহণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। জনৈক বিরোধা ব্যক্তি তৎকালীন এক পত্রিকায় নিম্নোক্ত ব্যঙ্গ কবিতাটি প্রকাশ করেন–

"পহলে তো সরে মিল্লতে বয়যাকে থে ওহ্ তাজ
আব আওর সুনো তাজকে স্যার হো গয়ে ইকবাল
কহতা থা য়িহ কাল ঠণ্ডী সড়ক পর কোঈ গুস্তাখ
সরকারকী দহ্লিয পে সর হো গয়ে ইকবাল।"

অনুবাদ—

"প্রথমে তিনি ছিলেন পবিত্র ধর্মের শিরে রাজমুকুট,
এখন আর শোন ইকবাল হলেন রাজমুকুটের 'স্যার'।
কাল ঠাণ্ডা রাস্তার পরে কোন নির্লজ্জ বলিতেছিল–
সরকারের চৌকাঠে ইকবাল নত করিয়াছেন শির।"[১]

খেতাব লাভের পর তাঁর সম্মানার্থে লাহোর জাহাঙ্গীরের মাজারে শাহেদরায় যে মহতী সভা হয়েছিল তার আয়োজন করেছিল লাহোরের হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকল শ্রেণীর লোক। শুধু লাহোরই নয়, পাঞ্জাব এবং আশ-পাশের স্থানসমূহ থেকে অগণিত মানুষ এ উপলক্ষে কবিকে মোবারকবাদ জানাতে সমবেত হয় সেই সভায়। জনগণের এই আন্তরিক অভিনন্দনে সেদিন স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে এ মহাকবি সত্যি জনগণের গর্ব।

লাহোরের এ সভায় ইকবাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইংরেজীতে। তাঁর নতুন গ্রন্থ 'পয়ামে মাশরেকে'র সংবাদও জনগণ এই সময়ই পায়। এর কিছুকাল পর ১৯২৩ সালের ২৪শে অক্টোবর আল্লামা ইকবাল মহারাজা স্যার কিষণ প্রসাদকে যে পত্র লেখেন তাতে একটি মজার ব্যাপার উল্লেখ করেন।

মাননীয় বড়লাট বর্তমানে লাহোরে অবস্থান করছেন। গতকাল তিনি পাঞ্জাবের নূতন হাইকোর্ট ভবনের উদ্বোধন করেছেন। চীফ জাস্টিস স্যার সাদীলাল এ উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার উত্তর দিতে গিয়ে বড়লাট বাহাদুর ইকবালের প্রশংসা করেছেন। তাঁর বক্তৃতার প্রকাশভঙ্গী অতীব সুন্দর ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উপলক্ষে ইকবালের প্রশংসার কোন কারণই ছিল না, তাই শ্রোতাদের অনেকেই হয়েছেন অবাক।

---

[১] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনুবাদ ।

আল্লামা ইকবালের জীবনের অনেক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় মীর্যা জালালুদ্দিনের লেখায়। ব্যারিস্টার মীর্যা জালালুদ্দিনের যে প্রবন্ধ মলফূযাতে ইকবাল' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ইকবাল সরকারী খেতাবকে অতি তুচ্ছভাবেই গ্রহণ করেছেন। এ খেতাব পাওয়ার কিছুদিন পূর্বে বিলেতের এক প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মুসলিম দুনিয়ার সমস্ত দেশ পর্যটন শেষে ভারতে এসে উপস্থিত হন। ভারতে এসে তিনি পাঞ্জাবের গভর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তুরস্ক হতে আফগানিস্তান পর্যন্ত যে দেশেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই শুনেছেন কবি ইকবালের নাম। স্বভাবতই তাঁর মনে একটা অদম্য কৌতুহল দেখা দেয়। তিনি লাহোর পৌছেই গভর্ণরকে অনুরোধ জানান ইকবালের সঙ্গে তাঁর একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে। গভর্ণর কবি ইকবালকে নিজ ভবনে আমন্ত্র্যণ করেন। এসব বড়লোকের বাড়ীতে যাওয়া ইকবাল বিশেষ পছন্দ করতেন না। তাই নানা অজুহাত দেখিয়ে তিনি বলতে লাগলেন পায়ের ব্যাথা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে, লাট সাহেবের বাড়ী কি করে যাওয়া যায়, ইত্যাদি।'

মীর্যা জালালুদ্দীন আরও বলেন, আমি ইকবালকে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে পরে নিজ মোটরে গভর্ণর হাউসে রেখে আসলাম। গভর্ণরের বাড়ি থেকে ফিরে তিনি সোজাসুজি আমার বাড়িতে এসে মোলাকাতকালে যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে তা হুবহু বর্ণনা করলেন। এর কিছুদিন পর গভর্ণরের পক্ষ থেকে ইকবালকে খান বাহাদুর, পরে সামসূল উলামা খেতাব দেওয়ার প্রস্তাব আসে। ইকবাল সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন।

এর কিছুকাল পরেই নাইট্হুড্ প্রস্তাব এলে স্যার জুলফিকার খানের অনুরোধে ইকবাল তা গ্রহণ করতে রাজী হন।

ইকবালকে যাঁরা ঠিকভাবে জানতেন না, তাঁরা এ খেতাব গ্রহণের পর কিছু কিছু সমালোচনা করতে লাগল, এমনকি মৌলানা জাফর আলী খান জমিনদার পত্রিকায় এ বিষয়ে এক ব্যঙ্গ কবিতাও লিখে ফেললেন। ইকবাল এসব বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই লাহোরের শাহেদরাহ বাগে যখন সভা হয় তখন গভর্ণরের সামনেই তিনি তুলুয়ে ইসলাম' বা ইসলামের অভ্যুথান শীর্ষক উত্তেজনাপূর্ণ কাব্য পাঠ করেন।

এর কয়েক বৎসর পূর্বেই ইকবালের প্রতিভাকে সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ডি-লিট ডিগ্রি দান করে।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই ইকবাল হৃদরোগে আক্রান্ত হন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যে তাঁর পক্ষে ব্যরিস্টারী চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে তিনি ব্যারিস্টারী ছেড়ে দিয়ে বিশ্রামের জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। অসুস্থতাবশত ইকবাল যকন ব্যারিস্টারী ব্যবসা ছেড়ে দেন তখন ভূপালের নবাব কবি ইকবালকে মাসিক পাঁচশত টাকার বৃত্তি দান করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ এবং শিশু পুত্রদের শিক্ষার জন্য সে বৃত্তি চলতে থাকে।

এ ছাড়া মহামান্য আগা খান ও স্যার আকবর হায়দরীর মারফত হায়দারাবাদের নিজ গ্রাম বাহাদুর এককালীন সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন। আত্মসম্মানে হানিকর মনে করে ইকবাল সে প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখান করেন।

ইকবাল চরিত্রের বিভিন্ন দিক

দর্শনপ্রার্থীদের জন্য ইকবালের দরওয়াজা সদা উন্মুক্ত ছিল। ব্যারিস্টারী ব্যবসা ছেড়ে দেবার পর ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুকা পান করতে করতে তিনি কখনও কুরসি বা সোফা, আবার কখনও পালঙ্কে বসে, আগন্তুকদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। যখনই কোন আগন্তুক দেখা করতে আসতেন, আল্লামা ইকবালের পুরাতন ভৃত্য আলী বখশ এসে খবর দিত আর সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকদের সংখ্যানুযায়ী চেয়ার এনে তাঁর পালঙ্কের পাশে সাজিয়ে দিয়ে যেতে। দর্শনপ্রার্থীদের সাথে তিনি তাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং রুচি অনুযায়ী আলাপ আলোচনা করতেন। মর্যাদাভেদে উচ্চস্তর বা সাধারণ স্তরের আলাপ আলোচনা চলত। কখনও কখনও কম কথায় তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। তাঁর সুদীর্ঘ আলাপে শ্রোতারা কখনও ক্লান্ত হ'ত না। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তিনি প্রাণ খুলে আলাপ করতেন। নিজেও হাসতেন তাদেরও হাসাতেন।

হুমায়ুন পত্রিকার সম্পাদক ব্যারিস্টার মিয়া বশীর আহমদ বলেন, ইকবাল ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যুর বৎসর যে রকম ছিলেন, সতর বৎসর পূর্বে ১৯৩১ সালেও সে রকমই ছিলেন। ঐ হুকা, ঐ পুরাতন ভৃত্য আলী বখশ, ঐ একইভাবে সালওয়ার আর কামিজ পরে পালঙ্কে বসা, কামিজের উপরের বোতামটি খোলা। পাঞ্জাবী ভাষায় সাধারণত কথা বলতেন আর বলে যেতেন সহজ ও সরলভাবে। তাঁর দরবারে যে আসতে চায় আসুক, যে কিছু বলতে চায় বলুক, কোন বাধা নিষেধ নেই। সব জ্ঞান সমুদ্রের মত ইকবাল বলে যাচ্ছেন, জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। কথায় কথায় যেন জ্ঞানের মুক্তা ঝরে পড়ছে। লোক যত বড় ছোট হোক তাঁর কিছু যায় আসে না। তারাও মানুষ তিনিও মানুষ। তাঁর সময় তাদেরও সময়, তবে অভিযোগ কিসের? কোন অহঙ্কার নেই প্রাণ খুলে সকলের সঙ্গে মিশে চলাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট।

ডক্টর সাইদুল্লাহ বলেন, কবি ইকবালের সঙ্গে যখনই আমার মেশার সুযোগ হয়েছে তখনই উপলব্ধি করেছি আমাদের এ মিলন কতই না সুখকর। তবু যাঁরা তাকে নিকট থেকে জানেন তাঁরাই বলতে পারবেন ইকবালের মতো এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যাঁর দরওয়াজা মানুষের মিলনের জন্য সর্বদা খোলা থাকে। তাঁর হুকুম ছিল যার খুশী আসুক যার খুশী যাক। ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করে চলেছেন কিন্তু কবির মুখে কোন বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। দু' চারজন হয়ত চলে গেল অমনি আবার কয়েকজন এসে গেল। ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এমনই ধারা চলতে থাকত। মাঝে মাঝে আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগত যে, ডক্টর সাহেব খানাই বা খান কখন আর লেখাপড়াই বা করেন কখন।

ডক্টর ইকবালের সাথে যে কত রকমের লোক দেখা করতে আসত তার ইয়ত্তা নেই। কোন সময় গিয়ে দেখি এক হেকিম সাহেব এসেছেন, তাঁর সাথে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আলাপ জমে উঠেছে। হেকিম সাহেব চলে গেলেন, সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি এলেন। তাঁর সাথে রাজনীতির আলোচনা হল। এ আলোচনা শেষ হবার পূর্বেই এক বয়োবৃদ্ধ লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আর অমনি ডক্টর সাহেব রাজনীতি ছেড়ে হাস্য-রসের কথায় মেতে উঠলেন। আমি একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে জার্মানীর এক পর্যটক আসর জমিয়ে বসেছেন। তাঁর সঙ্গে চলেছে 'স্থান ও কালের' উচ্চ দার্শনিক আলোচনা। পর্যটক আসন ছেড়ে না উঠতেই এক পাহলোয়ান এসে বসলেন। পরবর্তী আলোচনা চলল সেই পাহলোয়ানের সঙ্গে, বিষয়বস্তু শরীরচর্চা। যার সাথে যে কথাই তিনি বলুন না কেন আপন কথা বলার ভঙ্গীতে ডক্টর ইকবাল একক ও অপূর্ব।

'মুহম্মদ হোসেন আরশী বলেন, ১৯৩৫ সালের ১৫ই এপ্রিল আমি ডক্টর ইকবালের বাসায় যাই। আমার সঙ্গে ছিলেন হেকিম তালেব আলী। আমাদের পূর্বে সেখানে এসেছিলেন প্রসিদ্ধ মহিলা কবি সরোজিনী নাইডু এবং হুমায়ুন পত্রিকার সম্পাদক মিয়া বশীর আহমদ। তাঁদের সাথে কবি কথাবার্তা বলছিলেন ইংরেজীতে। জীবনে এই প্রথম, আমি এ মহিলা কবিকে দেখলাম। আরও একটি ঘটনা প্রথম দেখে বিস্মিত হলাম যে ডক্টর ইকবাল স্বীয় আসন

ত্যাগ করে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে এসে মহিলা কবিকে তিনি সম্মান জ্ঞাপন করলেন।'

ভদ্র ব্যবহার ছিল ইকবালের এক বিশেষ গুণ, সকলের সাথেই তিনি হাসি মুখে কথা বলতেন। এক ঝলক হাসি যেন তাঁর মুখে সর্বদা লেগেই থাকত, তাঁকে কেউ কখনও রাগ করতে দেখেনি। কোন বিষয় তার মনোমত না হলে তিনি নীরবে তা সহ্য করে যেতেন। মিথ্যা বলাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তিনি নিজে সর্বদা সত্য কথা বলতেন এবং সত্যপ্রিয় ব্যক্তিকে সর্বান্ত করণে ভালবাসতেন। বড়দের প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। ছোটদের জন্য তাঁর মনে ছিল অকৃত্রিম স্নেহ। একটি ছোট ঘটনায় তাঁর এ স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তখন বিলেতে, তাঁর পুরাতন ভৃত্য আলী বখশের সব কিছু চুরি যায়। বেচারা এক পত্রে আপন দুঃখের কথা ইকবালকে জানায়। ইকবাল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে এক স্নেহপূর্ণ জবাব লেখেন। সে স্নেহের পরশ পেয়ে আলী বখশ সেদিন সব হারানোর বেদনাও ভুলে গেল।

হাস্য রসিকতায়ও কবি ইকবালের তুলনা ছিল না। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার মিয়া বশীর আহমদ বলেন, '১৯১৪ সালের কথা। একদা আমি বার লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি কবি ইকবকাল ও ব্যারিস্টার মিয়া শাহনেওয়াজ এক কোণে বসে আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই ইকবাল হেসে উঠে সংবর্ধনা জানালেন ঃ আসুন মৌলানা সাহেব। তার এ সম্বোধনে আমি বিশেষভাবে লজ্জিত হলাম। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। এরপর প্রায় বাইশ বৎসর চলে গেছে- কিন্তু আমি যখনই তাঁর সাথে দেখা করতে যেতাম তখন প্রায়ই তিনি আমাকে হাসি তামাসার সঙ্গে মৌলানা বলে ডাকতেন। একদিন ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ডক্টর সাহেব আমি কোথাকার মৌলানা ? তিনি হেসে উত্তর দিলেন, আরে ভাই মৌলানা কি খুব বড় কিছু? না তাদের মাথায় শিং আছে? তুমি তো কিছু আরবী জান। আরবী জানলেই তো মৌলানা।'

স্যার আবদুল কাদির বলেন, যাঁরা সদা সর্বদা ডক্টর সাহেবের সাথে দেখা করে থাকেন তাঁরা জানেন হাস্য রসিকতা করতে করতে কখনও কখনও তাঁর সারা মুখমণ্ডল চিন্তায়ছেয়ে ফেলত।

ডক্টর সাইদুল্লাহ বলেন, নাদের খানের সাথে ইকবালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে সেই সময় নাদের খান ইকবালকে বলেন-'আপনাকে দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। কারণ আমার ধারণা ছিল আপনার সারা মুখে থাকবে সুদীর্ঘ দাড়ি আর চেহারায় থাকবে প্রবীণ গাম্ভীর্য। ইকবাল উত্তরে বললেন, আমিও অনুরূপ আশ্চর্য হচ্ছি-কারণ আপনি একজন জেনারেল, তাই মনে করতাম কাবুলের জেনারেলের শরীর হবে বিরাট দৈত্যের মত। অথচ দেখতে পাচ্ছি আপনি রোগা পটকা আমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ।'

স্যার ইকবাল সহজ ও সরল জীবনের পক্ষপাতি ছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অগণিত দার্শনিক এবং মর্যাদাসম্পন্ন বহু বড় বড় ব্যক্তিত্ব সর্বদা তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। অত্যন্ত সহজ ও সাধারণভাবেই তিনি তাদের গ্রহণ করতেন। কখনও কখনও শুধু তহবন্দ পরে এবং একটা বেনিয়ান গায়ে দিয়েই খাটে বসে তিনি আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানাতেন। বিনা বাধায় বিনা অনুমতিতে যে কোন লোক যে কোন সময় তাঁর সাথে দেখা করতে পারতেন। না ছিল তাঁর বাড়িঘর সাজানো-আর না ছিল তাঁর আসবাব পত্রের জাঁকজমকের বাহুল্য। প্রথম জীবনে আনারকলি বাজারের বাসায় যেভাবে বিনাআড়ম্বরে দিন কাটিয়ে দিয়েছেন পরবর্তী জীবনে খ্যাতি লাভ করার পরে ম্যাকলিয়ড্ রোডের বাড়িতেও তাঁর জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন হয়নি।

তাঁর জীবনে সারল্য সম্বন্ধে মৌলানা মউদুদী আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। পাঞ্জাবের এক বিত্তশালী মোয়াক্কেল এক জটিল মোকদ্দমার পরামর্শের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ আইনজীবীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার মুহম্মদ ইকবাল, স্যার ফজলে হোসেন এবং আরও কতিপয় খ্যাতনামা আইনজীবী। সে ব্যক্তি তাঁর বিরাট প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় তাঁদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত্রে ইকবাল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে শুতে গিয়ে দেখেন কক্ষে দুগ্ধ ফেননিভ সুকোমল শয্যা, আর কক্ষের সর্বত্র আরাম-আয়েশ, প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি।

এ সব দেখে তাঁর সুফী-মনে আঘাত লাগল, এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের কথা মনে পড়ে তাঁর চোখে অশ্রু দেখা দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডেকে অন্য এক সাধারণ কামরায় বিছানা বিছিয়ে নিয়ে সেখানেই রাত্রি যাপন করলেন।

ইকবালে বিনয়ের তুলনা ছিল না। পত্রে তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

জামালপুরের রইস মেজর সাঈদ মুহম্মদ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে মিলিটারী স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। উক্ত স্কুলকে ইকবাল মিলিটারী স্কুল নাম দেবার অভিপ্রায় করে কর্তৃপক্ষ ইকবালের অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্যার ইকবালের কাছে সে প্রস্তাব আসার সঙ্গে সঙ্গে অতি বিনীতভাবে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে কর্তৃপক্ষকে জানান–

মাননীয় মেজর সাহেব,

এক সাধারণ কবির নামে কোন মিলিটারী স্কুলের নামকরণ করা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। আমার মতে একে 'টীপু মিলিটারী স্কুল' নাম দেওয়াই সঙ্গত। টীপু হিন্দুস্থানের শেষ মুসলিম সৈনিক। হিন্দুস্থানের মুসলমানগণ এতসত্ত্বর তাকে ভুলে গিয়ে অন্যায় করেছে। দক্ষিণ ভারতে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি টীপুর কবর এখনও জীবিত। অথচ আমরা যারা বাহ্যিকভাবে জীবিত তারা শুধু মানুষকে জীবিত বলে ধোকা দিয়ে যাচ্ছি।

নিয়াযমন্দ-মুহম্মদ ইকবাল।

ইকবালের আত্মতৃপ্তি এবং মানসিক সন্তুষ্টিও ছিল অসীম। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই চেয়েছিলেন হায়দারাবাদের নিজামের দরবারে একটি চাকরী করে যাতে তিনি আর্থিক সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারেন। ইকবাল কিন্তু এ বিষয়টি খোদার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে স্যার ইকবাল মহারাজা স্যার কিষন প্রসাদকে লিখেছিলেন, আমি এ পর্যন্ত আমার নিজের কার্যাবলীর জন্য সব সময় নিজেকে অবস্থার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কাজের পরিণাম যাই হোক আমার কোন ভাবনা নেই। মনে এখনও সেই নির্বিকার ভাব, ভাগ্য যেখানে নিয়ে যায় তাতেই সন্তুষ্ট। অবশ্য হায়দরাবাদ যাওয়া আদৌ যদি ঘটে তবে তা আমার ইচ্ছার অনুকূলেই হবে।'

আর এক পত্রে স্যার রস মসউদিকে লিখেছেন ঃ ঐশ্বর্যের কোলে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনে আমি অভ্যস্ত নই! সত্যিকারের মুসলমানেরা সাদাসিধা এবং সংসারত্যাগীদের মতো জীবন-যাপনই করে গেছেন।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোভ করা কোন মুসলমানের পক্ষেই শোভা পায় না। আমার এ পত্রের কথাগুলোতে আপনি মোটেই আশ্চর্য হবেন না কারণ আপনি যে বংশের ছেলে, স্যার সৈয়দ আহমদের নাতি, আর যারা ছিলেন আমাদের সকলেরই আদর্শস্থানীয় সেই মহাত্মাদের জীবনযাত্রা ছিল এমনই সরল, এমনই আড়ম্বরহীন।'

সাধারণ বা কঠিন কোন রোগেই ইকবাল কখনও তিতা ঔষধ খেতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি মিষ্টি হেকিমি ঔষধ ব্যবহার করতেই পছন্দ করতেন। ফলের মধ্যে তিনি সবচাইতে ভালবাসতেন আম ও আঙুর ফল, খাদ্যের মধ্যে কাবাব এবং পোলাও ছিল তার প্রিয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত কবি গালিবও আম অত্যন্ত ভালবাসতেন।

ইকবালের জীবনে কোন এক সময় একটি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। একদিন ইকবালের কাছে এক দরবেশ এসেছিলেন। ইকবাল তাঁর কাছে কিছু দোয়া চাইলে দরবেশ বললেন,

কি চাও? ধন-দৌলত?

ইকবালঃ ধন-দৌলত আমার প্রায়োজ নেই।

দরবেশ ঃ মান ইজ্জত?

ইকবালঃ তাও খোদা প্রচুর দিয়েছেন।

দরবেশ ঃ তবে কি খোদার সাথে মিলতে চাও?

ইকবাল ঃ আরে দরবেশজী বলছেন কি? আমি সামান্য মানুষ, খোদা অসীম। তাঁর সাথে মেলা কি সম্ভব? জলবিন্দু সমুদ্রে মিশলে সে বিন্দুর আর কি কোন অস্তিত্ব থাকে? আমি বিন্দু হিসেবে বেঁচে থেকে সমুদ্র হতে চাই।'

এ কথা শুনে দরবেশ মুচকি হেসে বললেন, 'যেমন শুনেছিলাম ঠিক তেমনটিই পেলাম। তুমি নিজেই তো রহস্য সম্বন্ধে সচেতন। তোমাকে কে কি দোয়া দিতে পারে?

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ইকবালের ভক্তি ছিল অসীম। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার মীর্যা জালালুদ্দিন বলেন, আমার বাড়িতে টোং স্টেটের একজন শিক্ষিত ভৃত্য ছিল। সে প্রায়ই সেতার বাজিয়ে কবি হালীর 'মুসদ্দসে হালী'

কাব্য সুর সহযোগে আবৃত্তি করত। ডাক্তার ইকবাল প্রতি দু'তিন দিন অন্তর অন্তর এসে এর কাছে খুশী মনে মুসদ্দস শুনতেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রশংসায় মুসদ্দসের যে স্থানে বলা হয়েছে :

"ওহে নবীউনমে রহমত লাকাব পানেওয়ালা'

অর্থাৎ নবীদের মধ্যে হযরত রহমত খেতাবে ভূষিত সে পদ্যাংশ ইকবাল বার বার শুনতেন। অবশেষে রসূলের প্রেমে মশগুল হয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বিদায় নিতেন।

পীর আউলিয়া এবং দরবেশদের প্রতি ইকবাল ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। একবার লাহোরে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। সেখানে পৌছুতে ইকবালের বেশ দেরী হয়ে যায়। সে সময়ের মধ্যে চেয়ারসমূহ পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় মানুষেরা ফরাসের উপর বসতে আরম্ভ করে। ঠিক এমনি সময়ে ইকবাল উপস্থিত হন। আলীগড়ের প্রসিদ্ধ পীর জমায়াত আলী শাহ সাহেবকে একধারে একখানা চেয়ারে বসানোর পর চেয়ারে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে কবি ইকবাল তাঁর পদ প্রান্তে ফরাসের উপর গিয়ে বসতে বসতে বললেন, আউলিয়াদের পায়ের কাছে বসতে পারাও গৌরবের। পীর সাহেব হেসে উত্তর দিলেন, ইকবাল যার পায়ের নিকট এসে যায় তাঁর গৌরবের সীমা কোথায়? এর পর পীর সাহেব আরও বললেন, আপনার একটি কবিতা আমার বেশ মনে আছে। বলেই তিনি আবৃত্তি করলেন :

কওন আন্‌দাযা করা সাখ্‌তি হ্যায়
উস্‌কে যোরে বাযু কা
নেগাহে মরদে মুমেন সে
বদল জাতি হ্যায় তকদীর।

অর্থাৎ তাঁর হাতের শক্তি সম্বন্ধে কে ধারণা করতে পারে। ধর্মবিশ্বাসী লোকদের দৃষ্টির ফলে অনেক সময় অদৃষ্টের লেখা বদলে যায়।

কবি ইকবাল পীর সাহেবের মুখে এ কবিতা শুনে খুশী হয়ে বললেন, আমার নাজাতের জন্য এ লেখাই যেন কবুল হয়।

সাধক কবি ইকবাল মাঝে মাঝে আউলিয়াদের মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। লাহোরে হযরত দাতাগঞ্জ বখশ বা আলী হজুরী এবং শাহ মুহম্মদ গাউসের মাজারে গিয়ে ভক্তি জানাতেন।

মানবদরদী কবি ইকবাল ধনবানদের প্রতি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ আর গরীবদের প্রতি ছিল তাঁর অসীম প্রীতি। আর এ কারণেই তাঁর কাব্যে গরীবের অশ্রুকেই গভীর দরদের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে মর্যাদা দিয়েছেন তিনি দারিদ্রকে। ঐশ্বর্যশালীর অর্থ তাঁর কাছে ছিল একান্ত তুচ্ছ।

এমন মনোভাব ছিল বলেই তিনি রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপারেও বিরূপ সমালোচনা করে গেছেন। নেতাদের উল্লেখে তিনি বলে গেছেন রাজনৈতিক নেতাগণ সকলেই স্বার্থপর এবং বিশ্বাসঘাতক। সাধারণের মধ্য থেকে কোন নেতা জন্ম নিয়ে যদি দেশকে পরিচালিত করে তবে তিনিই হবেন দেশের সত্যিকার নেতা।

কতিপয় ছাত্রের সাক্ষাৎকার

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আজীমল হক জুনায়েদী বলেন, ১৯৩৩ সালের কথা- আমার তখন ছাত্র জীবন– কিছু সহপাঠিসহ গিয়েছিলাম লাহোরে। এ সময় মহাকবি ইকবালের দর্শনলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটেছিল। এমন একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি আমাদের মতো নগণ্য ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করবেন কি করবেন না, সন্দেহের দোলায় দোদুল্য মননিয়ে আমরা ইসলামিয়া কলেজ হোস্টেল থেকে রওনা হয়ে পড়ি। আমাদের দৃষ্টি রাস্তার দু'ধারে ইতস্ত ত ভ্রমণ করে সন্ধান করতে লাগল ফুলে ফুলে সুসজ্জিত এমন একখানা প্রাসাদ যার তুলনা লাহোরে পাওয়া যাবে না। হঠাৎ যেন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল। আমাদের গমন পথের দক্ষিণ দিকে একখানা জীর্ণ বাড়ির দ্বারপ্রান্তে ব্যারিস্টার মুহম্মদ ইকবাল নাম লেখা একখানি সাইনবোর্ডের উপর আমাদের নজর পড়ল। কবির বাড়ির সংলগ্ন বাড়িটিতে ছিল একটি লোহার দোকান। এমন বাড়ি- বিশেষ করে এই পরিবেশ, হতাশ হয়ে গেল আমাদের মন। আমাদের তৃষ্ণাতুর হৃদয় কাব্যের কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না ঐ পরিবেশে।

বাড়ির ভিতরে সাদা ও লাল দু'টি গুটি নিয়ে দুটো ছেলে খেলা করছিল। খেলা নিয়ে তারা এমন মেতে উঠেছিল যে আমাদের উপস্থিতির দিকে তাদের মোটেই খেয়াল ছিল না।

একজন ভৃত্যকে দেখতে পেয়ে তারই হাতে আমাদের পরিচয়পত্র ভেতরে পাঠালাম। পত্র পাঠিয়ে কম্পিত হৃদয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই ভৃত্য এসে খুশীর খবর জানাল কবি ইকবাল আমাদের দর্শনপ্রত্যাশী।

বসবার ঘরে প্রবেশ করে কবিকে দেখতে পেলাম। লাল সাদার সংমিশ্রণে উজ্জ্বল রঙের অপূর্ব এক খানা মুখ। সাধারণ একখানা চাদর গায়ে দিয়ে তিনি বসে আছেন। তাঁর দিকে প্রথম দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন জাতির অধঃপতনের দুঃখের মর্মান্তিক যাতনায় তিনি অস্থির।

সালামের পর শুরু হল মোসাফার পালা। হাত মিলাবার সময় তাঁর অপূর্ব আন্তরিকতায় প্রকাশ পাচ্ছিল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভাব।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। কামরার এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলাম-চারদিকে বই পুস্তক ছড়িয়ে আছে, কিছু খোলা, কিছু বন্ধ। কামরাটির আসবাবপত্র যথা ফরাস, কুরসী, দু'খানি ছবি এমন কি প্রাচীরগুলি পর্যন্ত-সবাই মিলে সাড়ম্বরেই যেন প্রচার করছিল যে এদের যিনি মালিক তিনি আড়ম্বর মোটেই পছন্দ করেন না।

কবি সাহেবই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলেন। আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা শিক্ষার লাইন কেন গ্রহণ করেছি। এত বড় কবি ও দার্শনিকের কাছে এমন এক দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সবাই বিব্রত বোধ করলাম। কিন্তু কবি নিজেই ভারতীয় শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে বললেন, আমাদের শিক্ষা চিন্তাশক্তিকে সম্প্রসারণের কোন সহায়তা করেই না, বরং আমাদের দৃষ্টিকেও করে না প্রসারিত। প্রত্যেক শিক্ষা পদ্ধতিই এমন ত্রুটিপূর্ণ যে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জ্ঞানটুকুও আমরা আহরণ করতে পারিনে। আর সে শিক্ষা আমাদের আধ্যাত্মিক পথে কি এগিয়ে নিয়ে যাবে বরং ধর্মকেই আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আলাপ আলোচনার মধ্যে অনেক সময় চলে গেল। আমাদের অনুরোধে তিনি কয়েক ছত্র কবিতাও লিখে দিলেন আমাদের। বিদায় নিতে গিয়ে মনে হল যেন নিজেদের পরিচিত জগৎ ছেড়ে অন্য এক নতুন জগতে প্রবেশ করে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছি। কোন এক অদৃশ্য যাদু যেন সম্পূর্ণরূপে আমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়েছিল। এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারাও কত গৌরবের।

ছাত্ররা তার সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি সব সময় ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। বর্তমানে মুসলমান সমাজে মানুষে মানুষে যে ভেদ-রেখা টেনে দেয়া হয়েছে তিনি তার তীব্র নিন্দা করতেন। তাঁর কণ্ঠে ক্ষোভ ও বেদনা ঝরে পড়ত যখন তিনি বলতেন, 'আমাদের পরিচয়ই হ'ল আমরা মুসলমান। বিশ্বাসী যে কোন ইমামের পিছনে আমরা এক রাকাত নামায পড়ি, এখানে জাতিভেদের স্থান কোথায়?' ইকবালের মত সংবেদনশীল মন ও ইসলামের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য আমাদের ক'জনের মধ্যে আছে। তাই একমাত্র ইকবালই বলতে পারেন, সিন্ধুর (খোদা তায়ালা) মধ্যে বিন্দুকে সৃষ্টি (খুদী) করার বাসনা আমার নেই, আমার কামনা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর সৃষ্টি।'

ইসলামী পতাকা প্রসঙ্গে ইকবাল

চাঁদ এবং তার বা শুধু চাঁদকেই মুসলমানদের জাতীয় পতাকার প্রতীক মনে করা হয়। কখন থেকে এর প্রচলন হয় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এ সম্বন্ধে আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল গাজী আবদুর রহমানকে লিখেছিলেন আমার ধারণা এ পতাকা হযরত বা তাঁর পরবর্তী সাহাবাগণের সময় প্রচলন ছিল না। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে কসতুনতুনিয়ায় এর প্রথম প্রচলন হয়। আবার কেউ কেউ এ মতও পোষণ করে থাকেন যে সুলতান সলিমই এর প্রথম প্রচলন করেন। তবে এ মতের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে।

খুব সম্ভব খ্রীস্টানদের সাথে মুসলমানগণের ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় এর প্রথম প্রচলন হয়। ক্রুসেডের যুদ্ধ বিবরণীতেও এর উল্লেখ আছে। মোটেই বিচিত্র নয় যে মহাবীর গজী সালাহউদ্দিনের সময়ই এর প্রথম আবিষ্কার। সালাহউদ্দিন তুর্কী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কুর্দী। সুন্নীমতের সমস্ত মুসলিম জগৎ এ পতাকাকেই তাদের জাতীয় পতাকা হিসাবে মেনে নিয়েছে। ইরানের অধিকাংশ লোকই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, তাদের অন্য ধরনের পতাকা।

কবি ইকবাল আরও বলেন, আমার মতে এ নিশান বা পতাকার আবিষ্কার আকস্মিকভাবে হয়েছে। ক্রুসেডের যুদ্ধকালে খ্রীস্টান সৈন্যগণ বিরুদ্ধ সৈন্যদলের সাথে পার্থক্য নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে তাদের বুকের কাছে ও পতাকায় ক্রুস চিহ্ন ব্যবহার করত। মুসলমানরাও তেমনি চন্দ্র ও নক্ষত্রের চিহ্ন ব্যবহার করতে লাগল, হেলাল শব্দের অর্থ বর্ধিত হওয়া–ঐতিহাসিকরাও তাই মনে করেন। অর্থাৎ ঐ নতুন চাঁদের ইশারায় শৌর্যবীর্য ও জয় বর্ধিত হয়ে উঠুক।

যে সব মুসলিম রাজ্যে অন্য প্রতীক-সম্বলিত পতাকা ব্যবহৃত হয় তাঁরাও এ মতকে সমর্থন করে থাকেন। কাজেই চাঁদ তারা খচিত পতাকাই তাঁর সময়ে ইসলামী পতাকা বলে অভিহিত হয়ে আসছিল।

ইকবালের মৃত্যুতে শোকবার্তা

স্যার মুহম্মদ ইকবালের মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোক সাগরে নিমজ্জিত হয়। দেশের বিভিন্নস্থানে শোক সভা করে দেশবাসী কবির অবিনশ্বর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। "বুল বুলে হিন্দ" কবি সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে হায়দারাবাদে সর্ববৃহৎ শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন ডক্টর খলিফা আবদুল হাকিম, ডক্টর ইউসূফ হোসেন খান, নবাব কায়কোবাদ জঙ্গ বাহাদুর, প্রতাবগিরির রাজা এবং আরো অনেকে। এই সব নামযাদা ব্যাক্তিবর্গের বক্তৃতা ছাড়াও সে সভায় পাঠ করে শোনানো হয়েছিল দেশ বিদেশ থেকে আগত মহান ব্যক্তিদের শোক-পত্র।

এই উপলক্ষে যে সব পত্র পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও দেশবরেণ্য মৌলানা হাসরত মোহানীর পত্র দু'খানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বিশ্বসাহিত্য দরাবারে ভারতবর্ষের স্থান অতি নগণ্য। এ অবস্থায় স্যার ইকবালের মত বিশ্বসমাদৃত কবিকে হারানো ভারতের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে ভারত ও বিশ্বসাহিত্যের সাহিত্যিক কেন্দ্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হ'ল অদূর ভবিষ্যতে তা পূর্ণ হওয়া কঠিন।'

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর একখানা পত্রের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রখানি লিখেছিলেন 'ইকবালের রচনাবলীর মুখবন্ধে হায়দরাবাদে ডক্টর মুহম্মদ আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ইকবালের কাব্য যে খ্যাতি অর্জন করেছে তা বিশ্বসাহিত্যে চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। কোন কোন সমালোচককে আমার ও ইকবালের কাব্যের তুলনামূলক বিচার করতে দেখে, আমি সত্যই দুঃখিত। সাহিত্য কাল ও সময়ের উর্ধে। আমার আরও বিশ্বাস আমি এবং স্যার মুহম্মদ ইকবাল সত্য ও সুন্দরের দুইজন সেবক। আর আমরা সেই সীমায় যেয়ে মিলে যাই যেখানে মানবের চিত্ত ও মস্তিষ্ক বিশ্বমানবের দরবারে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর উপহার এনে উপস্থিত করে।'

স্বাধীনতার বীর সৈনিক মৌলানা ফজল হাসান হাসরত মোহানী এক শোকবার্তায় জাবেদ ইকবালকে জানান, অদ্যকার সংবাদপত্রে ইকবালের পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে হৃদয়ে অসহনীয় আঘাত পেয়েছি। প্রার্থনা করি খোদা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বেহশতে স্থান দিন। আপনার হৃদয়ে সান্ত্বনা আসুক খোদার কাছে এ কামনাও করছি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই কাব্য চর্চায় আমার বিরাগ জন্মে। এখন ইকবালের মৃত্যুর পর সে বিরাগ বিতৃষ্ণার চরমে গিয়ে পৌছেছে।'

উপরোক্ত পত্র দু'টি ছাড়া সে সময় আর যাদের শোকপত্র পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, সরোজিনী নাইডু, স্যার তেজ বাহাদুর সাপরু, শ্রীকৃষ্ণ সিনহা, চৌধুরী স্যার সেহাবুদ্দিন, এস. এন. জাফরী এবং আরো অনেকে।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, 'স্যার মুহম্মদ ইকবাল বিশ্ব বিখ্যাত কবি। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির যে সেবা করে গিয়েছেন তা ভারত বিখ্যাত যে কোন ব্যাক্তির কার্যাবলীর সমকক্ষতার যোগ্য। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র দেশের বিশেষ করে মুসলিম সমাজের অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হল।'

নিখিল ভারত কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উক্তি, 'স্যার ইকবালের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদের আমি মর্মাহত। অল্পদিন পূর্বে তাঁর সাথে আমার আলাপের সুযোগ ঘটেছিল। রোগশয্যায় শায়িত থেকেও তিনি দীর্ঘসময় ধরে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলন। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বাধীন ভারত সম্বন্ধে তাঁর উদার মনোভাব আমায় বিস্মিত করেছে। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র লোপ পেল বটে কিন্তু তাঁর তেজোদীপ্ত কাব্য কাহিনী মানব হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে তাঁর নাম অবিনশ্বর করে রাখবে।'

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সভাপতি মিষ্টার সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বার্তায় লিখেছেনঃ স্যার মুহম্মদ ইকবালের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের সাহিত্যিক জগৎ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি-রেখা বিলীন হল। তিনি শুধু অদ্বিতীয় কবি বা সাহিত্যিকই ছিলেন না; তিনি বিরাট ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী ছিলেন। তার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। "সকল দেশের সেরা আমার

ভারতবর্ষ"-এই জাতীয় সঙ্গীতটিই তাঁর স্মৃতি আমাদের হৃদয় পটে অনির্বাণ করে রাখবে।'

মিসেস সরোজিনী নাইডু বলেন, 'মাটির ধরণী ইকবালের দেহকে আচ্ছাদিত করুক। কিন্তু তার কাব্যরূপ অপূর্ব রত্নরাজি ভাবীকালের কাব্যামোদীর বিস্মিত দৃষ্টিকে ও সৌন্দর্যে ঝলসিয়ে দিক।'

পাটনার ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী জনাব মুহম্মদ ইউনুস তাঁর শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'ইকবালের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ তার একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান সন্তানকে হারাল। কবি হিসেবে তাঁর সমকক্ষ খুব অল্পই ছিল। তার কাব্য ও কবিতা ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এবং তিনি সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন।'

সিনর মুসোলিনী তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং ইটালীয় ভাষায় তাঁর বহু কবিতার অনুবাদ করিয়ে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কতিপয় উর্দু সঙ্গীত ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। এহেন কবির মৃত্যুতে ভারতবাসী আজ সত্যই দারিদ্র।

বিহারের প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার শ্রীকৃষ্ণ সিনহার শোকবার্তা উপরোক্ত উক্তিরই পরিপোষক। তিনিও বলেন, ডক্টর স্যার মুহম্মদ ইকবালের মৃত্যু সংবাদে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তাঁর মধ্যে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হারালাম। ভারতবর্ষ অনেকাংশে দরিদ্র হয়ে পড়ল। তিনি ছিলেন আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর "সারা জাহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তা, হামারা" সঙ্গীত লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং করতে থাকবে।'

পাটনা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার স্যার সুলতান আহমদ ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেছেন, স্যার ইকবালের মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তাঁর তিরোধানে ভারতবর্ষ আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিকে হারিয়েছে।..... তাঁর খণ্ড কবিতাগুলির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানকে উন্নতির শিখরে আরোহন করার প্রেরণা দেওয়া। এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের নিকট গৌরবময় অতীত দিনের উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরা। তিনি শুধু একজন উচুদরের কবিই ছিলেন না, ছিলেন ততোধিক একজন দার্শনিক, তিনি একাই ছিলেন এক গোষ্ঠী। তাঁর স্থান সহজে পূরণ হওয়া অসম্ভব।'

উর্দু 'ইত্তেহাদ' পত্রিকা সম্পাদক সৈয়দ সুলতান আহমদ বলেন ঃ স্যার মুহম্মদ ইকবালের মৃত্যুতে মুসলিম জগৎ ইসলামের শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহককে হারিয়েছে। রাষ্ট্রগুরু জামালুদ্দিন আফগানীর মৃত্যু পর মুসলিম জগতে এইটিই বৃহৎ শোক সংবাদ।

এমনিভাবেই সেদিন দেশবাসী ইকবালের উদ্দেশ্যে ঢেলে দিয়েছিল তাঁদের অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। এতদ্ব্যতীত জাবেদ ইকবালের কাছে ব্যক্তিগত পত্রেও বহু মনীষী তাঁদের শোক জ্ঞাপনের সাথে সাথে ইকবালের শোকাহত পরিবারকে জানিয়েছে সহানুভূতি, দিয়েছে সান্ত্বনা।

ইকবালের দার্শনিক মত

দার্শনিক কবি, খাঁটি মুসলমান কবি ইকবাল আজীবন সাধনা করে গেছেন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করে বীর্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের পুনর্জাগরণের জন্য। ইসলাম তাঁর কাছে অপূর্ব শক্তির উৎসরূপে ধরা দিয়েছিল। তাই অদৃষ্টবাদ বা মোহময় মায়াবাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে ভারতের সাধনার ক্ষেত্রে তিনি প্রবর্তন করতে চাইলেন কর্মবাদ, জয় ঘোষণা করলেন ব্যক্তিত্বের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অদৃষ্টবাদ বা মানুষ নিয়তির দাস এ মত বিশেষভাবে দুর্বল করে ফেলছে পাক-ভারতের মুসলমানদের। বহু সাধক সূফীদের অনেকেরও ধারণা ছিল যে মানুষ মাত্রই অদৃষ্টের হাতে বাঁধা। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়।

প্রসিদ্ধ সূফী মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী বহু যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেছেন যে মানুষ কখনও শক্তিহীন অক্ষম নয় বরং সে আপন ইচ্ছা শক্তিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রতিদিনের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই আমরা বুঝতে পারি যে চলাফেরায়, কাজে কর্মে আমরা কত স্বাধীন। ঘৃণা, প্রেম, ভালবাসা, হিংসা, ক্রোধ সব কাজই আমরা নিজ ইচ্ছা প্রণোদিত হয়েই করি। কোরানে খোদা মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ যদি সব কাজে আপন ক্ষমতা প্রয়োগে অক্ষম বা অপারগ হ'ত তাহলে এই উপদেশের কোন সার্থকতাই থাকত না। প্রকৃতপক্ষে আপন আপন কার্য নির্বাহকালে সকল মানুষই সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাই তিনি বলে গেছেন–

"যে খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করে না সে কাফের, কিন্তু যে মানুষের অন্তরের অনন্ত ও অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করতে চায় না, তার উপর আশা রাখে না, সে তদপেক্ষা বড় কাফের।"

এমনি করেই খুদীবাদের মধ্য দিয়ে দার্শনিক কবি ইকবাল মানুষকে যে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চাইলেন তা অপূর্ব। মানুষের এই ব্যক্তিত্ববোধ––

এবং তার সম্যক অনুশীলনে আপন অন্তরের অনন্ত সম্ভাবনাময় বৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন করে সে যে জীবনে যে-কোন উচ্চতা লাভ করতে পারে তা শুধু ইকবালের বাণী নয়, এটা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। তাই ইকবালের লেখায় দেখতে পাই—

"দর দাস্তে জুনান মান জিবরিল জবুন সায়েদী

ইয়াজদান বা কামান্দ আওয়ার আই হিম্মতি মর্দানা"

অর্থাঃ- আমার পাগলামীর মরুভূমিতে জিবরাইল ত সামান্য শিকার। হে আমার সাহস ও শক্তি, স্বয়ং সর্বশক্তিমানকে বেঁধে ফেল।

বস্তুত "খুদীর" দর্শনই হচ্ছে তাঁর দার্শনিক মতাদর্শের ভিত্তি। এই দর্শনের সঙ্গে যার পরিচয় ঘটেনি, ইকবালের দৃষ্টিতে তার জীবনই অর্থহীন। এই দার্শনিক মতাদর্শই ইকবাল-কাব্যকে স্ফুরিত ও ক্রমবিকশিত করেছে। মানুষের দৃষ্টিকে দৃঢ়তায় অত্যন্ত মজবুত করে দিয়েছে। মানুষের মন ও মননক শক্তিশালী আর মুসলিম মিল্লাতকে দান করেছে এক অভিনব ও চিন্তা বিশ্বাসের এক মনোরম জগৎ" (১)

বহু সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্ন ও সমাধানের চিন্তায় মহাকবি ইকবাল বহু বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেন। সে সমস্ত সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, কোন যোগ্যতার ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে তা করবেন এই আশা করছি। তাবে একথা সত্য যে ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সৃষ্টজীবকে তিনি ভালবাসতেন অকৃত্রিমভাবে এবং সৃষ্টিকর্তার উপর ছিল তাঁর অটুট বিশ্বাস। তাঁর কাব্য ছিল দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশের বাহন। তাঁর জীবনের শেষ নিশ্বাসেও ছিল সে কাব্যের প্রকাশ।

১। ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধার

মুহাম্মদ আবদুর রহিম।

মৃত্যুর মাত্র দশ মিনিট পূর্বে আসন্ন বিদায়বার্তা ঘোঘণা করে তিনি এই কবিতাটি পাঠ করেন–

সরুরে রফতাঃ বায আয়েদ কে না-আয়েদ

নসিম আয হেজায আয়েদ কে না-আয়েদ
সর আমদ রোজগারে ঈ ফকীরে,
দিগর দান-এ রায আয়েদ কে না-আয়েদ।

অর্থাৎ—
"হেজাযের বায়ু তুলিবে শিহর,
হয়তো তুলিবে নাকো!
এই-যে ফকীর দূর দরবেশ তাহার জীবন দিল,
আজিকে তাহার চির অবসান হল।"

গ্রন্থ পরিচিত

১। আসরার-ই-খুদী

ব্যক্তিত্বের মন্ত্রে উজ্জীবিত ফারসী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ কবি ইকবালের দার্শনিক তত্ত্বের ধারক। ১৯১৬ সালে মুদ্রিত হয়ে এ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হলেও এর অধিকাংশ অংশই কবি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন ১৯১৪ সালে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায়।

২। রামুয-ই-বেখোদী

এই গ্রন্থেও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ইকবালের দার্শনিক মত ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা, জাতি ও সমাজ জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত করে সে সাধনার সত্যরূপ ফুটিয়ে তোলাই 'রামুয-ই-বেখোদীর বিষয়বস্তু। এই জন্য এই গ্রন্থকে আস্‌রার-ই-খুদীর পরিপূরক বা দ্বিতীয় খণ্ড বলে ধরা হয়ে থাকে। এই গ্রন্থেরও ভাষা ফারসী। মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয় ১৯১৮ সালে।

৩। বাঙ্গেদিরা

খিযরে রাহ তুলুয়ে ইসলাম, শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া প্রভৃতি খণ্ডকাব্য এবং এ সময়ের উর্দু কবিতা একত্রে সংগৃহীত করে বাঙ্গেদিরা (ঘন্টাধ্বনি) কাব্য সংগ্রহ প্রকাশিত করা হয় ১৯২৪ সালে।

৪। পায়ামে মাশরেক

কাব্যখানির ভাষা ফারসী। জার্মানীর দার্শনিক কবি গেটের দিওয়ান পাঠ করে তিনি এ গ্রন্থ রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। এর প্রথম দিকে রয়েছে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার দার্শনিক ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় ভাগে 'জীবন' কর্মজগৎ প্রভৃতি জাতীয় কবিতা ও কিছু গজল। এ ছাড়া সফেনহর, টলস্টয়, নীটশে কার্লমার্কস আইনস্টন, গেটে, বার্গসঁ, হেগেল প্রমুখ মনীষী নিয়ে লেখা ছোট ছোট কবিতা এবং তসখীরে ফিতরৎ' (সৃষ্টি অধিকার) নামক খণ্ড কাব্যও এর

অন্তর্গত। ১৯২৩ সালে এ গ্রন্থ প্রথম ছাপা হয়। আফগানিস্তানের ভাগ্যাহত সম্রাট আমীর আমানুল্লার নামে কবি এ কাব্য উৎসর্গ করেন।

৫। যবুরে আজম

এটিও ফরাসী গ্রন্থ। তিন ভাগে বিভক্ত এই গীতিকাব্যে কবি স্রষ্টা, মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। 'গুলশানে রায জাদীদ' 'বন্দেগী- নামা' প্রভৃতি খণ্ড কাব্য ও গজল এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ সালে।

৬। জাবিদনামা

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থ কবি ইকবালের লেখনীর চরম উৎকর্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। ফারসী ভাষায় এখানে কবির আকাশ ভ্রমণের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছ। গ্রন্থখানি দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়ার' আদর্শে রচিত। তাঁর প্রিয় পুত্র জাবিদ ইকবালের নামানুসারে তিনি এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। কাব্য শেষে কবি তারুণ্যের প্রতীক জাবিদ ইকবালকে উদ্দেশ্য করে তরুণ সমাজকে এক মহৎ জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে প্রতীচ্যের বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৭। মুসাফির

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত উর্দু খণ্ড কাব্য। ১৯২৮ সালে আফগানিস্তানের শিক্ষা-সংস্কার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আহূত হয়ে--পাক-ভারত থেকে গজনী যান আল্লামা ইকবাল, রস মসউদ ও মৌলানা সুলেমান নদভী। সেই উপলক্ষেই কবি আফগানিস্তানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ-স্থানগুলি ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরে এই ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতাই মুসাফির কাব্যে প্রকাশ করেন।

৮। ইসলাম কা মযহাবী তখাইউল

মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দারাবাদে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী।

৯। বালে জিবরিল

কবির শেষ বয়সে লেখা উর্দু কবিতার সমষ্টি-এর অধিকাংশ কবিতাই তিনি ইংলণ্ড, স্পেইন ও পেলেস্টইনে বসে রচনা করেন। ১৯৩১ সালে জামে মিল্লিয়ার সভায় পঠিত 'কবিতাটিও এই গ্রন্থের অন্তর্গত। ১৯৩৫ সালে

প্রকাশিত-এই পুস্তকে তিনি সর্বহারাদের আশার বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। 'সাকীনামা' নামক খণ্ডকাব্য এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

১০। পস্ চে বায়েদ কর্দ আয়ে আকওয়ামে শরক

ইটালীর আবিসিনিয়া দখলের পটভূমিকায়-মসনভী ছন্দে রচিত এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই গ্রন্থে ধর্ম, রাজনীতি, খোদাতত্ত্ব প্রভৃতির সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনার পর কবি পাশ্চাত্যের মোহপাশ ছিন্ন করে নব বলে এগিয়ে যাবার জাগরণ-মন্ত্রের বাণী শুনিয়েছেন এশিয়াবাসীদের।

১১। জরবে কলিম

এটিও উর্দু গ্রন্থ। অনেকে এ গ্রন্থকে 'বালে জিবরিল'- এর পরিশিষ্টও বলে থাকেন। কারণ 'বালে জিবরিলের' বক্তব্য-বিষয় এখানে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে।

১২। আরামগানে হেজাজ

শেষ জীবনে এবং রোগশয্যায় রচিত উর্দু ও ফারসী কবিতা সংগ্রহ, দুই খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে প্রেরিত মহাপুরুষদের বিষয় ফারসীতে রচিত। দ্বিতীয় খন্ডে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতির সমস্যার অবতারণা এবং সমাধানের ইঙ্গিত। ইকবালের পীড়ার সময় বইটির সংকলন আরম্ভ হয় কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে কবির মৃত্যুর পর।

১৩। Development of Metahysics in Persia.

এটি লেখকের পি-এইচ-ডির থিসিস। প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে।

১৪। Reconstruction of Religious thought in Islam.

মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং আলীগড়ে প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতার সমষ্টি। এ গ্রন্থ প্রথম প্রকশিত হয় ১৯০৮ সালে। বর্তমান জগতের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম দর্শনের পুর্নগঠনের চেষ্টাই এই বক্তৃতাসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এ ছাড়া এ সময়ে জওহরলালের প্রশ্নের উত্তরে ইকবাল দু'টি পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থ দু'টি--

(১) Islam and Quadianism.

(২) Islam and Ahmadism.

১৫। Letters to Jinnah. প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৪৪ সালে।

১৬। Speeches and Statements of Iqbal. এরও প্রথম প্রকাশ কাল ১৯৪৪ সালে।

১৭। Tulips of Sina. ছাপা হয় ১৯৪৭ সালে।

১৮। Persian Psalms. প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে।

১৯। আস্‌রার-ই-খুদীর ইংরাজী তরজমা Sebets of Self প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। এছাড়া কবির 'পায়ামে মাশরেক' এবং Development of Metaphpsics in Persia. গ্রন্থদ্বয় জার্মান ভাষায়ও অনুদিত হয়েছিল।

সংগ্রহ ও চয়ন কবিতা ও কাব্যাংশগুলিকে সন্নিবেশিত করতে কালানুক্রমিক ধারা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই বহুল পরিচিত ও বিখ্যাত লেখকদের রচনাসমূহ পরবর্তী অংশ সংযোজিত হয়েছে।

নালায়ে এতিম

হায় ! কি বলি, বক্ষপঞ্জরে এখন আর প্রাণ নেই।
উজ্জ্বল প্রদীপ যখন র্নিবাপিত হয়ে যায়
মহফিলের যোগ্যতা তার থাকে না।
হে জীবন কাব্যের লীলাভূমি- আমি তোমার উপযুক্ত নই;
নৈরাশ্য যা অতিক্রম করতে পারে-এটা তেমন স্থানই নয়।
হায়! শারাবখানার মজলিসে আমি কি মুখে শরীক হই,
চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় যা - আমি যে সে পেয়ালা।
আফসোসের কাঁটার কাছে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকও লজ্জা পচ্ছে-
দুঃখের ইউসুফ প্রাণ বাজারের সৌন্দর্য-পণ্য হতে চলেছে।
আমার হৃদয় ফরিয়াদ রোধ করত অপারগ হতে শুরু করেছে।
দিলের কান্নার সুর আকাশের সান্নিধ্য লাভ করতে চলেছে।
ধ্বংসীভূত বাগানের বুলবুলের যে গান-
সে গানের সুর কেন শত ফরিয়াদের চেয়েও হৃদয়বিদারক হবে না ?
অস্বস্তির হাত এগিয়ে আসছে পরণের কাপড় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য-
দুঃখের অশ্রু জামাকাপড় প্লাবিত করে নীচের দিকে বইতে লাগল।
ক্রন্দনরত দিল উষর প্রান্তরের জন্য এমনি চঞ্চল হয়ে পড়েছে
ফুল বাগিচার জন্য বুলবুল যেমন ছটফট করতে থাকে।
জীবনের হাটে বসে এখন আর আমরা কি কিনতে পারি ?
(হে মন) যাও কোন প্রান্তরে গিয়ে একাকী বসে ক্রন্দন কর।
ক্ষোভ-দুঃখ অভ্যস্ত দিল-আনন্দ উপভোগের উপযোগী নয়,
কবর শিয়রে জ্বালানো প্রদীপ-খুশীর মজলিসের উপযুক্ত নয়।

আসমানের নীচে আরাম উপভোগকারীর চিহ্নই নেই
ক্ষোভ-দুঃখ ছাড়া সুখের কপোলে লালিমা নেই।
আমার আনন্দ প্রভাত ও শত সায়াহ্নের ঈর্ষযোগ্য
মানুষের অস্তিত্ব আরামের দিলের ধূলো-স্বরূপ
জীবন সাগরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে আশা ভরসার জোয়ার ভাটার উপর
মাঝে মাঝে আবার খুশীর হাওয়াও এসে পড়ে।
যে মুহূর্তে জীবনে ভালোবাসার আলোকচ্ছটা পড়ল
পরিবর্তনের ঘনঘটা - তখনই বিপদের ঝড় নিয়ে আসল।
কারো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, কেউ বা ব্যর্থ মনোরথ হল–
এই দৃশ্যের - পরিণাম কিন্তু কবরের মাটি।
হে আসমান ! তোমার কাছে সৌভাগ্য বৃদ্ধির আশা !
তোমার প্রত্যেকটি তারা সৌভাগ্য-তারার হৃদয়-ক্ষত-স্বরূপ।
তুমি কাউকে বঞ্চিত করতে বাকি রেখেছ?
হে মুসলানগণ ! কান্নার রোল আকাশের গতিপথ ভেদ করছে।
বন্ধুত্ব আর কারো কাছ থেকে পাইনে- বন্ধুরা সব গেল কোথায়?
বন্ধুদের সমাপ্তি ঘটল-দোস্তদের হলো কি?
দুঃখের অবস্থা প্রকাশ--ভাষার অসাধ্য;
বর্ণনার ভঙ্গি দুঃখের তীব্রতাকে র্খব করে দেয়।
দুঃখ-বেদনার কাহিনী জিহ্বা পর্যন্ত আসতে পারে না
আমার মুখর ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন বেদনার হাসি লেগে আছে।
'বাকশক্তি রহিত করা'ই যেন নীরবতার কয়েদখানার আদেশ
বিষাদ প্রকাশের অপরাধীকে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে।
হৃদয়-ক্ষতের কোন মলম আমি খুঁজে পাচ্ছি না-
মানুষের রূপধারী-আমাকে নিজের ভাগ্যেরই বিলাপ করত হচ্ছে।
পিতার আশ্রয় ছায়ার জন্যই আমার কান্নাকাটি,
হাঁ, হে অশ্রু ভারাক্রান্ত আঁখির সাগর-আমাকে তুমি ডুবিয়ে দাও।
বাল্যকালের আশা আকাঙ্খার জন্য-হে হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠে না।
তুমি 'এতিম হওয়ার' অশ্রুর তিক্ততার জন্য এসেছ।

হে পিতার আশ্রয় ছায়া তুমি রহমতের ছায়াস্বরূপ
বাল্যকালের মুকুলের উপর তোমার আগমন পূরবী বাতাসের মত।
দুনিয়ার প্রান্তরে তুমি খিযিরের মত পথপ্রদর্শক।
তুমি ত করুণাময়ের করুণার এক জীবন্ত প্রকাশ।
শিশুকালের রাজত্বে তুমি একচ্ছত্র প্রভাবশালী তুমি না থাকলে-
যিন্দেগী এক শৃংখলহীন বন্দিখানা।
কিন্তু শিশু বয়সেই নবচন্দ্রের মত কোমর বেঁকে গিয়েছে;
প্রৌঢ়ত্বের প্রভাব 'এতিম হওয়ার' রূপ নিয়ে এসেছে
ব্যর্থতার স্মৃতি ওকে কি জানি কি বুঝিয়ে গিয়েছে
বেদনার প্রজ্জ্বলিত শিখাকে আরো উত্তেজিত করে গিয়েছে।
নিশ্বাসের বদলে আমার বুকে তরবারীর ক্ষুরধার আছে
আমার জীবনটাই মৃত-পুস্তকের ব্যাখ্যা।
হে সাগর ! -প্রবল বাতাসের প্রকোপেই তোমার উদ্বেলতা,
এবং তোমার এই সব উচ্ছলতা চাঁদের আকর্ষণেই হয়।
তোমার রাজকীয় মর্যাদা-পাহাড় ও সমুদ্রের দরুনই প্রতিষ্ঠিত আছে।
এই সূর্যের আলোকচ্ছটায় তোমার ললাট হাস্যোজ্জ্বল।
পৃথিবীর সুপরিকল্পিত পরিচালনায় ও 'উপায়হীনতার' উপকণ নেই
তবে কেন 'এতিম হওয়াটা' নিঃসহায়তারূপ বাযপক্ষীর শিকার হলো?
চিত্র শিল্পী ফুলের হাসির দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে পারে
এবং হে বিদ্যুৎ- তোমার চপলতার চিত্র মোটেই কঠিন নয়।
প্রভাত তারকা - কল্পনার কলমের জন্য কঠিন নয়।
কিন্তু আমার মুচকি হাসির রূপ অন্য ধরনের।
এই মুচকি হাসি - আফসোসের অশ্রু-লাবণ্য বৃদ্ধি করে
প্রচ্ছন্ন বেদনাকে লুক্কায়িত রাখবার - এটা এক পর্দা বিশেষ।
অতীত দিনের স্মৃতি ! তুমি আমাকে বিচলিত করে ফেলেছ
হায় হে কল্পনার আঁখি ! তুমি কি সব দেখে ফেল্লে !
হে যাত্রীদলের বিচ্ছেদ ! এ তুমি কি দেখালে?
প্রচ্ছন্ন বেদনার আঘাত আরো জাগরূক করে তুল্লে।
দুই হাতে কল্‌জে চেপে ধরে বসে রয়েছি

হে ব্যর্থ হৃদয়। এই রোগের কোন চিকিৎসা কর।
স্বর্গের ঈর্ষাউদ্দীপক ফুলবাগানের বহু বাতাসের সুরভি
এসেছে যার পায়ের আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয় না।
প্রভাত সূর্য-রশ্মি জালের নৃত্য স্বাদ।
কিংবা রাত্রিশেষের পাখির গানের সুরের উত্থান পতন
নির্বাচকদের শহরে কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না
কবরের চায়ায় নিদ্রিত লোকদের জাগাতে পারে না।

হে হৃদয়! প্রত্যেক মুহূর্তে অশ্রুর নদী প্রবাহিত করা উচিত নয়
যেমন কাহিনী তেমনি শ্রোতবর্গের প্রয়োজন।
প্রত্যেকের কাছে এই দুঃখের কাহিনী বলে ক্রন্দন করা উচিত নয়;
এর জন্য হাশিম বংশীয় এতিমের (সঃ) দরবারের প্রয়োজন।

অন্তচক্ষুর দৃষ্টিও কেমন দ্রুতগামী।
একটি মুহূর্তের মধ্যে-সামনেই পুণ্যবানদের শাহানশাহের দরগাহ্!
হে দরিদ্রদের সাহায্যকারী! হে নিঃসহায়দের আশ্রয়স্থল!
হে উপায়হীনদের সাহায্যকারী! হে সম্বলহীনদের সম্বল!

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কাফেলা হৃদয় থেকে যাত্রা করেছে–
আমি আমার দুঃখ বেদনার কাহিনী বলতে এসেছি।

সমস্যার সমাধানের জন্য ত তোমার মহিমামণ্ডিত সত্তা আছে
আর্ত হৃদয়ের জন্য তোমার নাম আরোগ্যস্বরূপ।
আকাশের নির্যাতন সহ্য করার শক্তি নিরূপায়দের থাকে না;
ঐ হৃদয়সমূহে ক্রন্দনরোল সহ্য করার শক্তি থাকে না।

এমন কোন্ বিপদ আছে– যা বর্ণনার ঋণে আবদ্ধ নয়?
একমাত্র 'এতিম হওয়া' জিহ্বার ঋণজালে বন্দি থাকে না।

আমার মূর্তিই নিরানন্দ হৃদয়ের কাহিনীস্বরূপ
আমার নীরবতাও তোমার সাহায্য ভিক্ষা করে।

তুমি দুনিয়ার মজলিসে মর্যাদার আসনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী
তুমি মানুষের জন্য রহমতের নিদর্শন স্বরূপ-জিবরাইল।

হে জ্ঞান বিজ্ঞানের আবাসভূমি!-তুমি উম্মতের কেবলাস্বরূপ
হে ইমান আঁখির জ্যোতি-তুমি প্রত্যেক প্রশংসার অলংকার স্বরূপ।

মানুষের যত দুঃখদৈন্য তার প্রতি সহানুভূতি তোমার বক্ষপঞ্জর থেকেই উঠেছে।
প্রীতি উদ্বেলতার লোহিত সাগর তোমার আঁখির জল থেকে উঠেছে।
প্রীতি-তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুষ্ক তৃষিতদের জন্য তুমি 'আবে কউসর' স্বরূপ।

তুমি সেইসাগর যার প্রতিটি বিন্দুতে শত মুক্তা থাকে
তুর পর্বতে অবস্থিত মুসা কলিমুল্লার (আঃ) চোখের তারা তুমি
'ইয়াসিনের অর্থ তুমি; 'যাও আদনার' ইঙ্গিত তুমি।

ঐ ব্যক্তি তোমার জ্যোতির্ময় সত্তাকে চিনতে পারেনি
যে 'মিম' ছাড়া 'আহমদের' রহস্য বুঝতে পারেনি।

প্রাণমাতানো হিসাবে তুমি মায়ের হাসির মতো
পিতার স্বরের মত 'কউসর' থেকেও সুস্বাদু তুমি।

আরশ-মুকুটের সৌন্দর্য বাড়ে বা দিয়ে তুমি সেই মণি
মানুষের ভাগ্যের জন্য তুমি সৌভাগ্য তারকা।

তুমি দুনিয়ার সম্ভ্রান্ত মানুষের মহফিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী
যদিও আবির্ভাব সর্বশেষে কিন্তু মর্যাদায় তুমিই অগ্রগামী।

তোমার মর্যাদা 'লাওলাকা' আয়নার মুক্তাস্বরূপ
তোমার করুণায় বিশ্বাসের চোখের পাতা আর্দ্র হয়।

আসমানের আঁখি তোমার ছায়ায় উজ্জ্বল
যাকে স্পর্শমণি বলা হয় তা তোমার দরজার ধুলো।

তোমাকে নিরীক্ষণ করা মুসার (আঃ) সাধ্য কোথায়?
তুমি তূর পর্বতের চূড়ায় ধ্বনিত 'লানতারানী'র প্রতীক

কৃষকের পক্ষে দুপুরের আগুন-কষ্টের সময়
ঘাম থেকেই প্রচণ্ড সূর্যের প্রভাব প্রকটিত

কিন্তু চেহারার উপর আশার ঝলক খেলতে দেখা যায়
যখন সে পরিশ্রমের সংগ্রহ করে।

"ইয়া মোহাম্মদ" বলে সে নিজের নিজের কাজ থেকে উঠে
পড়ে আঃ তোমার নামে সে কি শান্তিই না পায়?

সেই সত্যধর্মের আশ্রয়স্থল-সেই হেরা গুহার কিনারা
তোমার পদগৌরবে যা সিনাই পর্বতের ঈর্ষাস্থল হয়ে গেল।

সেই নিরাপত্তার দুর্গ-সেই ফারান পর্বতমালা
যার প্রতিটি কণা থেকে 'পরিপূর্ণ ধর্মের' আওয়াজ উঠেছে।

যা তোমার পদস্পর্শ গৌরবে আসমানের মত হয়ে গিয়েছে
এই দরণী মহিমকামণ্ডিত আরশের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে।

সৃষ্টির বিধানে অসহায়ের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই নেই
অতৃপ্ত মনের কাজই হলো অভিযোগ করা।

তোমার দরজায় এসে পড়েছি-এখন সাহায্যের সময়
আমার দুঃখ দৈন্যের বদলে কৃপা ভিক্ষা চাই।

উপায়হীনতার বর্ণনা জিহ্বা পর্যন্ত আসতে পারেনি-
তুমি তোমার 'এতিম হওয়া' আমাকেক সাহস দিয়েছে।
হে অশান্ত হৃদয়, একটু থাম- এ কি আওয়াজ আসছে
যা চির প্রবহমান ঝরনার পানির কলতানকে লজ্জা দেয়।

হৃদয়কে যা প্রেমবহ্নি-জালায়-প্রজ্জ্বলিত করে তোলে
আত্মাকে যা আল্লাহ স্মরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হে মন! মানুষের সম্মান প্রদর্শনের জন্য সৌজন্য বাড়িয়ে তেলো!
আমি মহামান্য 'লাওলাকা'র সাথে কথা বলছি।

হে এতিম হওয়ার বন্দি! হে দুঃখের জেলখানার কয়েদী!
তোমার দ্বারা শ্রেষ্ঠ উম্মতের সরদারের প্রাণের আরাম।

নৈরাশ্য তোমার উপর এরূপ নির্যাতন করেছে–
বিষাদ-বেদনার ফরিয়াদ তোমার দিলকে চিরে ফেলেছে।

তোমার সম্বলহীনতা দেখে কেন আমার অন্তর জ্বালা করবে না?
তোমাকে নিরাশ্রয় বলতে লজ্জাবোধ হয়।

প্রাণের-স্তূপে বিদ্যুৎপাত হওয়া তোমার কাহিনী–
বক্ষপঞ্জকে তোমার প্রাণ নেই– আছে শুধু দুঃখের বিলাসাগর।

তোমার পরিত্যক্ত ভূমি-ধ্বংসের চাইতেও ভয়াবহ
আনন্দ যেখানে ভয় পায়–সেটাই তোমার নীড়।

তোমার অসন্তুষ্ট মনের কারণে আসমান কেঁপে ওঠে–
তোমার ফরিয়াদে গৌরবান্বিত আরশও নড়ে যায়।

তোমার ক্রন্দরত চক্ষু তোমার রক্ত অশ্রু ঝরায়
কেন তোমাকে প্রচ্ছন্ন বেদনায় বারাক্রান্ত দেখতে পাই?

কেন তোমাকে আমি সম্বলহীন অবস্থায় দেখতে পাই?
কেন তোমাকে প্রাণহীন দেহের মত দেখতে পাই?
আমার উম্মত কি পয়গম্বরের দুঃখের শরীক (সহানুভূতিশীল নয়?)
দুনিয়ায় কি কিয়ামতের শাফায়াতকারীর প্রেমিক নেই?
নবূয়তে যেমন আমার চাইতে অগ্রগামী কেউ নেই–
আত্মমর্যাদাবোধে তেমনি আমার উম্মত থেকে কেউ অগ্রসর নয়।

সাহস ও সততার পরীক্ষায় আর কেউ অগ্রসর নয়
মুসলমানদের চাইতে আত্মসম্মানবোধে কেউ এগিয়ে নেই।

এরা মনে প্রাণে আল্লাহর নামে উৎসর্গীকৃত
ফেরেশতারা যাদের উপর কোরবান হোক–এরা সেই মানুষ।

যাও, গিয়ে বল– হে মুস্তাফার বাগানের ফুলসমূহ
যামানার হাওয়া যেন তোমাদের প্রতি বিমুখ না হয়ে যায়।

অস্তিত্বের ময়দানে দাবী পূরণের জন্য-
এতিমের দোয়া শত আকসিরের ঈর্ষাযোগ্য।

এটা সেই জাদু-যাতে বঞ্চনার দৈত্য দূরীভূত হয়,
এটা সেই ব্যবস্থাপত্র যাতে পাপের ব্যথা দূর হয়।

এই দোয়া হাশরের ময়দানে অত্যন্ত কাজে লাগবে।
আল্লার মহিমার সাক্ষীর (মোহাম্মদের) বক্ষ আলিঙ্গন করাবে।

আল্লার প্রেমের আগুন দিয়ে তোমাদের উত্তপ্ত করে তুলবে
মুসা (আঃ)ও যা দেখেননি, তা তোমাদের দেখাবে।

যে রকম কারবালার শহীদের প্রতি আমার ভালবাসা আছে
আল্লার কাছে তেমনি এতিমের দোয়া অতি প্রিয়।

নিজের সাহসের শিরাকে উত্তেজিত করা উচিত।
যামানাকে আহমদী মর্যাদাবোধ দেখানো উচিত।

দুঃখের বন্ধন থেকে এতিমদের মুক্ত করা উচিত
সম্মিলিত চেষ্টায় বদান্যতার এক দরিয়া প্রবাহিত করা উচিত।

এই পুরানো আসমানের নীচে দৌলত ছাড়া কোন কাজই চলে না
সোনার পানি ছাড়া মকসুদের খেজুর বাগানে ফল আসে না।

'এতিম হওয়া'র বাযপক্ষীর শিকারের ছটফটানি অন্য রকম
যার তীক্ষ্ণধার প্রবেশ করে সে কাঁটা অন্য ধরনের।

ভাগ্য বিড়ম্বনার রোগের চিকিৎসার অন্য রকম
বিপদ-ব্যথার যন্ত্রণা মুক্তির মসিহ্ (সধ্বন্তরি) অন্য কেউ।

এই ব্যথা কলিযায় ফুঁ দেয়, হৃদয়কে চমকিয়ে তোলে
তবে এটা স্নেহ ভালবাসার ব্যবস্থাপত্রে দূরীভূত করে।

সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই 'এতিমী' ইসলামের অনুরাগী ছিল
এতিমরাই প্রথম ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস হৃদয়বানদের কাছে ঘোষণা করছে,
এতিমদের উপর ইসলামের দান অসীম।

যদি তোমরা বোঝ–তবে এটা শত কথার এক কথা
আমার এতিমী'র সম্মান রক্ষা এখন তোমাদেরই হাতে॥

অনুবাদ ঃ আবু যোহা নূর আহমদ

হিমালয়

হিমালয়! হিমালয়! হে ভারত-সাম্রাজ্য প্রাচীর
আকাশ আনত শীর্ষে নিত্য চুমে তব উচ্চশির।
কালের কঠোর চিহ্নতোমাতে অঙ্কিত নাহি হয়,
অম্লান যৌবন তব করিয়াছে সন্ধ্যা-উষা জয়।
বাহিরের চর্ম চক্ষে তুমি শুধু প্রস্তর পাষাণ,
সত্য দৃষ্টি কহে, তুমি ভারতের রক্ষক মহান্।
তুষার তোমার শিরে পরায়েছে উষ্ণীব গৌরব
প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক প্রাণে নাহি সে যে হাসিছে নীরব।

অনন্ত অতীত কাল কোথা গেছে নাহি জানি ঠিক,–
বর্ষীয়ান, তব কাছে সে যে শুধু মুহূর্ত ক্ষণিক।

উপত্যকা কোলে তব কৃষ্ণমেঘ রচে চন্দ্রতাপ,
তোমার শিখর সনে সপ্তর্ষির চলে মন্ত্র জপ।
মৃন্ময়ী ধরণী-বুকে যদিও সে বিরাজিছ তুম্বি
তব সত্য অধিষ্ঠান নীলাঞ্জন উর্ধ্ব নভভূমি।
হিমালয়! হিমালয়! তুমি ক্রীড়া-আনন্দ-অঙ্গন–
জড়ের ক্রীড়ার লগি স্রষ্টা তোমা করেছে সৃজন!
চঞ্চল মেঘের নৃত্য হেরি যবে তব শীর্ষ পরে,
উদ্বেল আনন্দে কাঁপি চোখে মোর সুখ-অশ্রু ঝরে।
মনে হয় করি দল চিরমুক্ত শৃঙ্খলবিহীন
উড্ডীন বিহঙ্গ সম শূন্যপথে হতেছে বিলীন।
তোমার অঙ্গন হতে বহে নদী সঙ্গীত-মধুর,

পীযুষ-অমৃত সুধাতব বারি তারো শ্রেয়তর।
সুনির্মল বারি ত সে যেন গো সৃষ্টির মুকুর,
বক্ষে তারি সারা বিশ্ব হেরিতেছে বিম্ব সুমধুর।
নদী তব বক্ হ'তে বহে নাচি' নৃত্য সাবলীলা
পাষাণ প্রহত কভু-জাগে মধু কল হাস্য-লীলা।
হে পথিক! হে চেঞ্চল! চিরযাত্রী হে নদী-প্রবাহ!
চিত্ত মোর বুঝিতেছে নিত্য তুমি কি সঙ্গীত গাহ।
হিমালয়! হিমালয়! কহ কহ্,-অতীত কাহিনী,
যে দিন আদিম নর প্রথম কুঠির-গেহখানি
রচেছিল বক্ষে তব সৃজনের উদ্বেল আশায়,
কৃত্রিম কুহক-ছাপ ঢালেনি কালিমা যবে তায়।
হে কল্পনা-সাথী মোর! চল মোরা যাই পুনঃ ফিরে,
সে দিনের চিরশান্ত মৌন-পূত উষা-সন্ধ্যা-তীরে,
হে কাল-গতির চক্র! নিত্য তুমি কোন দূরে ধাও?
অতীত কালের বুকে আবার ফিরে যাও।

অনুবাদ : বেনযীর আহমদ

নয়া শেওয়াল

ব্যথাহত হৃদে আমি ত্যাজিয়াছি মসজিদ মন্দির;
যে যাজক, শুনিব না আর কভু তব ধর্ম-বাণী
শতধিক নীতিকথা মধুময় অপূর্ব কাহিনী।
তুমি ভাবো, খোদা ওই মূর্তিমায় পাষাণ প্রাকারে
আছে বন্দি! মোর তবে প্রিয় মোর স্বদেশের ধূলি!
প্রতিকণা লভে তার সে খোদার অপরূপ রূপ!
এসো তবে পুনরায়; দাও তুলি দাও যবনিকা
অপরিচিতির হীন; দূরে যারা আছে সবে আজি
ডাকো কাছে; ফেলো মুছে বিরোধের কলুষ কালিমা!
হৃদিতল আছে পড়ে কততাল স্তব্ধ জনহীন,
এসো মোরা রচি সেথা মরমের নব নিকেতন;
হোক্ তাহা পৃথিবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ সমুন্নত শির;
চূড়াতে ত'ার তুলে ধরি ওই দূর নীলিমার গায়
সকল ভক্তের প্রেমের গানে আছে শান্তি আছে নীতিবল,
নিখিল-মানব-মুক্তি লভে রূপ প্রেমের মাঝারে।

অনুবাদ : ফযলুর রহমান

শিক্‌ওয়াহ্‌

তোমার সেবক ব'লে খ্যাতি লাভ করেছি আমরা ভবে;
দুঃখের কথা শুনিয়ে দিতে বাধ্য হ'লাম আজকে সবে।
চুপ যদিও বীণার মত কাঁদছে পরাণ রবে।
বিলাপ যদি বেরোয় ঠোঁটে নাচার ব'লে ক্ষ'মো তবে।
নালিশ আজি করছে, খোদা! তোমার বান্দা, শোন;
স্তব স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদের নিন্দা শোন,।

ছিলাম মোরা অদ্বিতীয় যোদ্ধা-দলের গণনায়।
লড়তাম মোরা কভু ভূমে, আরও কভু দরিয়ায়।
"আযান" মোরা ধ্বনিয়াছি ইউরোপেরও গিরিজায়,
কখন বা আফ্রিকারি রৌদ্রতপ্ত সাহারায়।
তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে বাদশাহি এ দুনিয়ার।
"কলমা" বাণী ভুলিনি কো পড়লে শিরে তলোয়ার।

যুদ্ধ মাঝে ওয়াক্ত হলে পড়ত সবে মিলে নামাজ,
কাঁতার বেঁধে "কিব্‌লা" মুখে ভূমিষ্ঠ শির আহলে হিজায
একই সারি পাশাপাশি খাড়া মাহ্‌মুদ এবং আয়ায,
রইত না কো কোনও তফাৎ কে ভিখারী, কে মহারাজ
মনীব চাকর আমীর গরীব হ'ত সবাই এক আকার।
এলে তোমার দরবার মাঝে থাকত না কো ভেদ বিচার।
নিন্দা তো নয়, ধনরত্নে পরিপূর্ণ ভারি ভাণ্ডার,
সভার মাঝে বলতে পারে বাক্য দু'টি শষক্তি নাই যার।
বিধর্মী পায় হূর ও দৌলত সংসার মাঝে, সহ্যের এ বার,
আর বেচারা মুসলিম তরে শুধুই হূরের এক অঙ্গীকার!
নাই কো এখন অনুগ্রহ, নাই কো তোমার মেহেরবানি।
একি কথা! সবেক মত নাই আর সে নেক নজরখানি।

মুসলিমের আজ ধরায় কেন ভাগ্যের এত বিড়ম্বনা?
জানি তোমার শক্তির তরে নাই কো সীমা, নাই গণন।
ইচ্ছা হ'লে মরুর বুকে বহাও তুমি প্রস্রবণ।
ধুধু প্রান্তর মাঝে পান্থে করতে পার জল-মগন।
অন্যেরা দেয় খোঁটা মোদের, মুসলি আজি নিঃস্ব সবার।
তোমার নামে মরে যারা, ভাগ্যে তাদের দৈন্য কি সার?

অন্যেরে চায় দুনিয়া এসে, মুসলমানে চায় না কো আর।
মোদের তরে হ'লে শুধু খেয়ালি এক দুনিয়াই সার।
দুনিয়া হ'তে বিদায় মোরা, অন্যে হেথা করুক সুসার।
বল না ফের "তৌহীদ" তব লুপ্ত হল বিশ্ব মাঝার।
বাঁচতে চাই এ দুনিয়ায় যেন কায়েম তোমার নামটি রয়।
সম্ভব সে কি! রয় না সাকী, শুধু সুরার জামটি রয়।

অনুবাদ ঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়াহ্‌

আচম্বিত হ'ল ধ্বনি,-বিষাদ-মাখা তোমার বাণী,
পত্রে তোমার চাপিয়ে দেছে অঝোর ধারে চোখের পানি।
আকাশ' পরে পেরিয়ে গেছে তোমার বিলাপ ও মস্তানি।
পাগলা হিয়া খুলে দেছে জিভের লজ্জা বাঁধনখানি।
কিবা সুন্দর কথার রীতি! ধন্য তব নালিশেরে!
খোদার সাথে করতে আলাপ শক্তি দিল মানুষেরে

দয়া-উন্মুখ আমি সবটাই; কিন্তু কোথায় যাচ্‌নাকারী।
পথ দেখাব কাহার তরে? নাই যে পথে যাত্রাকারী।
সার্বজনীন শিক্ষা আমার; নাই কো কেহ শিক্ষাকারী।
আদম যাতে গড়তে পারি, এমন মাটি নাই তৈয়ারী।
প্রদান করি যোগ্য হ'লে কারো আমি রাজ্য ধন।
দিই তো আমি সন্ধানীরে দেখিয়ে কভু দেশ নতুন।

শক্তিশূন্য হস্ত তোমার, নাইকো হৃদে সে "ঈমান" জোর,
"উম্মত" হ'য়ে "পয়গাড়্যারের" নিন্দাকারী, ধিক্ প্রাণে তোর
বিদায় সব ব্রুত-ভঙ্গকারী, ভূত-পূজারী আজ করে শোর।
ইব্রাহীমের বংশে আখের পুত্র হ'ল কি না আযর!
পানকারী সব নূতন নূতন, পাত্র নূতন, মদ্য নূতন।
কাবা নূতন, ভুতও নূতন, তোমরা বেকার অদ্য নূতন।

তোমার তরে সকাল জাগার এমন লেঠা কভূ ঘটে?
আমি তোমার প্রিয় পাত্র? না, ঘুম তোমার প্রিয় বটে।
স্বাধীন তুমি, রমযানে তাই প্রাণটা আই ঢাই ক'রে ওঠে।
বল দিকিন এমন করে বন্ধু জনে কিংবা শঠে?
ধর্মেতে হয় জাতির গঠন, ধর্ম নাই ত তুমি নাই।
নাইকো যদি মধ্যাকর্ষণ, গ্রহ সূর্য ভূমি নাই।

সংসার মাঝে অকর্মণ্য যার কুখ্যাতি, সে যে তুমি;
উদাসীন তার বাস্ত হ'তে হায়! যে জাতি, সে যে তুমি;
বজ্র ঘন পোড়ায় যাহার ফসল ক্ষেতি, ে যে তুমি;
বাপ দাদাদের গোরগুলি যার হয় বেসাতি, সে যে তুমি।
পায় কি কভু সুনা ভবে কবর নিয়ে যার ব্যাপার?
পাও যদি হায়! মাটির পুতুল, বেচতে রাজি সব তোমার!

বল্লে ভাল,--মুসলিম তরে শুধুই হূরের ওয়াদাখানি।
নিন্দা মিছে করলে নাকি বলবে লোকে গুণী জ্ঞানী?
সৃষ্টিকর্তা ন্যায়-বিচারী এই চিরকাল দস্তুর জানি।
বিধর্মী পায় হূর ও দৌলত নিলে আইন মুসলমানি।
কি ক'ব হায়! দুঃখের কথা কেউ তোমাদের চায় না হূর।
মুসা কোথায়? নয় ত আজও তূর পাহাড়ে ঐ যে নূর।

অনুবাদ ঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আস্‌রারে খুদী

ইঙ্গিত পর্ব

দিনের প্রথম সূর্য দুরন্ত আঘাতে যবে
সর্ব শরীর তিক্ত ক্লান্তি করিলো হরণ
অশ্রুর নীহারে কাঁপে নিষিক্তি পুষ্পের দল রক্তিম বরণ;
নার্গিস ফুলের তন্দ্রা মুছিয়া দিলাম আমি অশ্রুর প্রবাহে
জাগিয়া উঠিল অণু অচেতন ছিলো যাহা মৃত্যুর প্রদাহে।
আমার উচ্ছাসে জাগে শীত শীর্ণ কিশলয় দল
আমার দীপ্তির রাগে মৃত-বীজ হ'য়েছে চঞ্চল।

আমার গানের সুর পরখ করিয়া নিলো বাগানের মূল আ-ধিকারী
সে-সংগীত সুষমায় গড়ে নিলো সেইজন বাঁকা তরবারী।
মাটিতে ছড়ালো সেই আমার অশ্রুতে সুপ্ত প্রাণ-বীজকণা
নূতন জাগতে জাগে একসাথে একক্ষেত্রে
পুষ্পের লালিত্য আর আমার বেদনা।

পরমাণু আমি মাত্র, তবুও উজ্জ্বল সূর্য একান্ত আমার
আমার অন্তরে হাসে দীপ্ত ছবি অনেক উষার;
আমার ধূলার কাছে তুচ্ছ আজ জাশদের পানপাত্রখানি
আমার মাটিরে আমি গ'ড়ে নিই পৃথিবীর সব সপ্ন আনি।
আমার চিন্তনে আজ অনেক কুরঙ্গদল হ'য়েছে সংহার।
অলক্ষ্য আবাস হ'তে যাহারা নেয়নি খু'জি প্রাণের অঙ্গার।
আমার পুষ্পের বীথি এনেছে প্রশান্তি এক অনেক উজ্জ্বল
যদিও সবুজবর্ণে তাহাদের পত্রগুলি হয়নি সজল :
নেকাব প্রচ্ছায়ে মোর আচ্ছন্ন রয়েছে কত পুষ্প অপরূপ
আমার সুরের টানে বাদকের দল সব হইল নিশ্চুপ।

আমার আঘাতে কাঁপে ধরণীর সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুল্বি
বহিরিয়া বিশ্বে এই তুলিলাম ওষ্ঠ' পরে নির্দেশ-অঙ্গুলি,

আমার বাঁশীতে আছে অপরূপ সুরের আভাস
মধুর নির্যাসে যা'র কেঁপে ওঠে সুনীল আকাশ।
জন্মেছি পৃথ্বীতে এই নূতন সূর্যের মতো নবীন উচ্ছ্বাসে,
এখানে কোনো তত্ত্ব শিখি নাই নতুন উল্লাসে;
নতুন সেতারা আসি আমার জাতিরে আজো করেনি মলিন
গলিত সোনার রঙ্গ আমার পর্বত চূড়া হয়নি রঙিন।
সৃষ্টির সৌন্দর্য আজো মোর কাছে পরিচিত নয়;
নেহারিয়া বিম্বলোক ত্রস্তপ্রাণে আপনারে লুকাইতে হয়।

পূর্বের সীমান্ত হ'তে আমার উজ্জ্বল উষা।
রাত্রির তমসা যবে করিলো হরণ
নতুন শিশিরে কাঁপে নিষিক্ত পুষ্পের দল রক্তিম বরণ।
ব'সে আছি তা'র লাগি' মধুর প্রভাতে যা'রা করিবে বন্দনা।
প্রশান্তি পেয়েছে সেই আমার অগ্নিকে যেই ক'রেছে অর্চনা।
অধুনা উচ্ছল দিন শুনিবে না মোর কোনো গান,
আগামী দিনে কবি আমার সুরের লাগি' পেতে আছে কান।
আমার গভীর তত্ত্ব ব্যর্থ হ'ল এ-যুগের কাছে
আমর য়ুসুফে তা'র অতীতের দোসরেরা যাত্রা করিয়াছে।
পুরোনো বান্ধব লাগি' গড়িলাম অশ্রুর সাগর
আমার মুসার লাগি, সিনাই পর্বত চূড়া র'য়েছে ভাস্বর।

তাহাদের সমুন্দর র'য়েছে আজি শিশিরের মতো
আমার নীহারে জাগে তরঙ্গ-বিক্ষেপ আজ সাগর-সঙ্গত।
এই ধরণীর নয় আমার এ-রোমাঞ্চিত বাণী
তাহাদের সঙ্গীতের কল্লোলে পড়িলো ধরা
পৃথিবীর সূক্ষ্ম স্পর্শখানি।
মৃত্যুর অনেক পরে অনেক কবির ভাষা
রূপ দিলো নীল আকাশেরে
নতুন আকাঙ্খা দিলো ব্যাকুলিত শেষ নিমেষেরে,
আমাদের চোখে দিলো নতুন আলোর রশ্মি

যদিও তাহারা সবে মৃত্যু-অচেতন
পুনরায় তাহাদের যাত্রার দীপ্তিতে যেন
প্রাণ পেলো অজানার নিশ্চল কেতন;
গোলাব জাগিলো চাহি কবরের বুকের উপর
সবুজ ছায়ায় হাসে মরুভূ ধূসর।
অনেক কাঁরাভা যাত্রা শেষ হ'লো স্তব্ধ পরিচয়ে
আমার কণ্ঠের সুর তৃপ্ত নয় কোনই সঞ্চয়ে
প্রণয়-প্রমত্ত কণ্ঠে আমার বক্তব্যগুলি জানাইবো
বন্ধু সবাকারে
হাশরের উচ্চকিত ব্যাকুলিত কলরোল
রূপ দেবে আমার ভাষারে।
যন্ত্রের সংগতি নাই আমার গানের সুর
ধ'রে রাখিবার

তবু জানি আমি এই বেহালার তন্ত্রী মোর
ছিঁড়িবে না উচ্ছ্বাসে আমার।
আমার উদ্দাম স্রোত সাগর প্রবাহগুলি
করিবে উন্মাদ
একবিন্দু জলকণা আপন অন্তরে তাই
ব্যর্থতার আনিবে সংবাদ।
আমার ওমান কভু কোন শান্ত নহরের
বুকে জাগিবে না
আমার চঞ্চল বন্যা সসীরের প্রান্তে আসিবে না;
হাজারো সাগর মিলি গ'ড়ে নেবে আমার প্রবাহ
নতুন পল্লব মেলি নবীন বিস্ময়ে প্রাণে
জাগিবে উৎসাহ।

যদি না ফুলের কুঁড়ি বিকশিত হয়ে গড়ে
গোলাব-বিতান

আমার সজল মেঘে পাবে না খুঁজিয়া কেহ
প্রাণের সন্ধান।
বজ্রও নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবাস ল'ভেছে আজ
আমার আত্মায়
পর্বত-প্রান্তর ত্যাজি চলিয়াছি নব-মূর্ছনায়
সমতল ভূমি যদি তোমার দোসর হয়,
আমার সমুদ্র সাথে ঘটাও সংঘাত;
সিনাই পর্বত যদি তোমার আবাস হয়
বক্ষ পাতি' লও মোর বজ্রের সম্পাত।
প্রাণের নহর হ'তে অধিকার পাইয়াছি
পান করিবার
জীবনের গূঢ়তত্ত্ব মিশিলো প্রজ্ঞায় মোর ইঙ্গিতে আত্মার।

গানের প্রভাবে মোর ধূলার নগণ্য কণা প্রাণ পেলো আজ
মেলিয়া উধাও পাখা পরে নিলো দেহোপরি খাদ্যোতের সাজ
জানে না কেহই হেথা কোন গূঢ় সত্য আমি শোনাব এখন
চিন্তার মুকতা দিয়া যে সঙ্গীত রচিয়াছি,
অনবদ্য তার আবেদন।
অনন্ত প্রাণের তথ্য যদি পেতে চাও তুমি
এসো মোর কাছে।
মর্ত্য ও স্বর্গের তথ্য তাও মোর আছে!
জান্নাত শিখালো মোরে বিজ্ঞতার নব সংবেদন
স্বজন বান্ধবে আমি জানলাম আত্মার চেতন।
হে সাকী! ঢালিয়া দাও স্বর্ণময় পানপাত্রে
রঙিন নিঝর
আমার অন্তর হতে বিমুক্ত হউক আজি
অশান্ত প্রহর।

যমযমের উৎস হতে এক কাতরা পানি যদি কেহ করে পান–
যদি সে সর্বহারা, সার্থক হইবে তার অমৃত সন্ধান।

সুগভীর হবে চিন্তা, দৃষ্টি হবে সুতীক্ষ্ণ করুণ,
মাটির কণিকা হবে পর্বতের শৃঙ্গে দীপ্ত নতুন অরুণ।

শক্তিহীন জীব হবে নবীন সামর্থ্য নিয়া সিংহের সমান
যমযমের এই তো এক নিত্যস্ফুর্ত প্রাণবন্ত দান,
ধূলার কণিকাগুলি প্রাণ পেয়ে উড়িবে আকাশে
পানির একটি বিন্দু সাগরের কালোল্লাস আনিবে আভাসে,
গভীর প্রশান্তি ভাঙি দিন হবে মথিত উত্তাল
ঈগলের রক্তে হবে তিতিরের পদনখ লাল।

হে নবযৌবনা সাকী ঢেলে দাও মোর পাত্রে
ফেণোচ্ছল পানীয় রঙিন
চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ রূপে চিন্তার তিমির মোর
হয়ে যাক ক্ষীণ,
বিভ্রান্ত পথিকে' যেন দিতে পারি পথের নির্দেশ
অশান্তি আনিতে পারি ক্লান্তক্লিষ্ট মানসে বিশেষ।
নূতন সন্ধানে আমি হব অগ্রসর
নব-বোধনায় যেন উচ্ছ্বসিত হয় আজি প্রাণের নহর।

অক্ষির অন্তরে দীপ্ত তারকার সম
প্রজ্ঞাবান মানুষের আমি হব বন্ধু অনুপম;
পৃথিবীর কর্ণরন্ধে ঢেলে দেব সঙ্গীতের সুধা
যাহার আবেশে তৃপ্ত হবে জানি আমার বসুধা।

নতুন আনন্দে মোর কাব্যের সমৃদ্ধি হবে একান্ত নিশ্চয়,
আমার অশ্রুতে সিক্ত হবে কত শুষ্ক কিশলয়।
রূমীর প্রতিভা মোরে করেছে লালন
তাঁহার ইঙ্গিতে আমি বহু সুগোপন তথ্য করিব জ্ঞাপন।
অগ্নি লেলিহ-শিখা অন্তর তাহার
সে-অগ্নির কণা হতে গড়া হল প্রতিভা আমার।

সামান্য পতঙ্গ আমি পুড়িলাম তাঁর দীপ্ত অগ্নির রেখায়
আমার সঙ্কীর্ণ পাত্র উচ্ছ্বসিত হল তাঁর মদের ফেনায়,
রূমীর ইঙ্গিতে মোর মাটি হল সোনার সমান
এক বিন্দু ভস্ম পেলো লেলিহান শিখার সম্মান।
ক্ষীণকায় বালুকণা মরুভূ হইতে তার যাত্রা শুরু করে
সূর্যের প্রখর ভাতি তাহার সুহৃদ হয় নতুন প্রহরে।
উদ্বেল তরঙ্গ আমি তাঁহার সাগর বুকে লভিব বিশ্রাম
একান্ত আমার হবে অগণন মরকৎ নয়নাভিরাম।

তাঁহার সঙ্গীত সুধা পান করি, হয়েছি উন্মাদ
তাঁহার ভাষণ হতে আহরণ করিয়াছি জীবন-সংবাদ।
নিশীথ হয়েছে ঘন নব-প্রাণ বোধনায় আমার অন্তর আজ করিলো ক্রন্দন।
ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে মোর ভেঙে গেল স্তব্ধতার অতীত বন্ধন
অনুযোগ-পূর্ণ সুরে পৃথ্বীর ব্যথার কথা
আল্লার হুযুরে আমি কাতরে জানাই
পাত্রের নিঃস্বতা ছিলো, দুঃখ মোর তীব্র হল তাই।

বেদনা বিষাদে মোর নিমীল নয়ন
তন্দ্রায় জড়িত হয়ে দেখিলো কল্যাণময় মধুর স্বপন;
সত্যের গৃহীতা যিনি লিখেছেন ফোরকান ইরানী ভাষায়
কহিলেন তিনি মোরে জাগাইয়া চিত্ত মোর নবীন আশাস্ত
"হে প্রেমিক নবীন প্রভাতে
প্রেমের অমৃতে পূর্ণ পাত্র তুমি তুলে লও হাতে।
হৃদয়ের সব গান একতালে কল্লোলিয়া তুলুক উল্লাস
একটি আঘাতে শুধু হৃদয়ে তন্ত্রীতে তব জাগুক উচ্ছ্বাস
পাত্রের কার্নিস যেন আঘাত আঁকিয়া দেয় মস্তকে তোমার
অক্ষির সান্নিধ্যে তব দীপ্ত হোক বাঁকা তলোয়ার।

তোমার হাসির আলো উৎস হোক বহু বেদনার,
তোমার চোখের পানি রক্তাক্ত করিয়া দিক অন্তর সবার।
ঘুমন্ত কুঁড়ির মতো কতদিন রবে তুমি শান্ত অপ্রতুল?

প্রমুক্ত গোলাবসম ব্যর্থভাবে উড়াইবে সৌরভ অতুল!
ব্যথায় মুমূর্ষু হয়ে বাক্যহীন রহিয়াছ তুমি।
রক্তিম অঙ্গারে জ্বলি চঞ্চল হউক আজি তব মনোভূমি।
শান্তিরে লাঞ্ছিত করে কলকলে জানাও বারতা।
দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে জানাইবে অন্তরের তীব্র আকুলতা
পূঞ্জীভূত অঙ্গারের তুমি দীপ্ত প্রাণ–
পৃথ্বীতে প্রশস্ত হোক আলোর সন্ধান।

তোমার জ্বলন্ত ছবি অন্যের অন্তরে দিক দাহন পিপাসা
মিথ্যা হোক, মিথ্যা হোক অতীতের অনেক নিরাশা
মদ্য বিক্রেতার যত সুগোপন তথ্যগুলি জানাইয়া দাও
ভীতির মুকুরগুলি সম্পূর্ণ বিচূর্ণ করি ধূলায় ছড়াও।
সুরার উচ্ছ্বাসে তব মুহূর্ত রচনা করি স্ফটিক ভাতিতে
গড় অঙ্গ আবরণ
পুনর্বার পথ-প্রান্তে সুরার পেয়ালাগুলি
করিও না কভু আহরণ।
লাইলির গোত্র হতে সংবাদ আনিয়া দাও মজনুর দ্বারে
সঙ্গীতে লাবণ্য আনো, নবছন্দ এনে দাও তারে;
সমবেত জনগণে প্রাণময় করে তোলো সঙ্গীত সুধায়
প্রত্যেক জীবন্তপ্রাণ আশ্রয় লভুক আজ আলোয় গুহায়।

বল তুমি 'উত্তিষ্ঠত'-- সে কণ্ঠ শুনিয়া যেন
সকলেই হয় গো চঞ্চল
নতুন পথের প্রান্তে দেখিতে পাইবে তুমি
দ্যুতিমান সবুজ অঞ্চল
অতীতের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন ভুলিয়া যাও
দেখো এল কিনা
সঙ্গীত সুরভিগুলি, যাহার উৎসেতে আছে নব মনোবীণা,
কাঁরাভা যাত্রার তুমি প্রাণদ ইঙ্গিৎ
নতুন উল্লাস প্রাণে জাগ্রত করিয়া দিক তোমার সঙ্গীত।"

রূমীর আদেশ শুনি 'উচ্ছ্বসিত হল বক্ষ নব চেতনায়,
প্রাণবন্ত হল কণ্ঠ নব-দ্যোতনায়।
তন্ত্রীর আকুতি হতে সুর হয়ে জেগে উঠিলাম
কর্ণের গ্রহণ লাগি স্বর্গ রচিলাম।

ব্যক্তিত্বের নব সূত্র রহিলো না মোর কাছে আর অপ্রকাশ
অন্তগূঢ় তথ্য তঁর রচিলো উচ্ছ্বাস।
অসমাপ্ত মূর্তি আমি শ্বেত মর্মরের
রূপহীন, ভীতিহীন ব্যর্থ ছবি মলিন স্বপ্নের।

প্রণয় আবর্তে পড়ি' ব্যক্তিরূপ হইলো উজ্জ্বল
পৃথ্বীর জ্ঞানের পথে চূর্ণ হল আড়ষ্ঠ শৃঙ্খল।

আকাশের গতি-রেখা দেখিয়াছি আমি বহুবার,
চন্দ্রের শিরায় আমি দেখিয়াছি রক্তের সম্ভার।

ধরার মানুষ লাগি অনেক নিশীথে আমি
করিয়াছি অনেক ক্রন্দন
কামনা শুধুই ছিলো– ধরণীর সব তথ্য
নবরূপে হয় উদঘাটন।

জীবনের গোপনতা বস্তুর আবেশ হতে
কামনা করিলো এক মুক্তি অনুপম
অহেতুক স্বপ্নমায়া অনাকাঙ্খা প্রাণপুঞ্জে আনেনি সম্ভ্রম।
তামসী নিশীথে আমি এনেছি সৌকর্য, আর
এনেছি সৌরভ
ক্লেদহীন বিশ্বস্তিতে মৃত্তিকারে দিয়াছি গৌরব–

সে বিশ্বাসে ধন্য হল পর্বত প্রান্তর আর উপত্যকাভূমি
মৃত্যুহীন সঙ্গীতের সম্পর্শের লালিত আজ
ধন্য হল মানবের প্রাণকেন্দ্র চুমি ঃ
মাটিতে বপন করি একবিন্দু পরমাণু

নূতন সূর্যের লাগি রচিলো আসন
রূমী ও আত্তার সম অনেক কবিরে তাহা করিলো লালন।

দীর্ঘশ্বাস আমি মাত্র : স্বর্গের সীমান্ত মোর গতি বহমান;
ভস্মের প্রতিভূ আমি; তবু অগ্নিরে আমি করেছি মহান।

উতুঙ্গু চিন্তার গতি আমার লেখনী হতে নিঃসরিত করে নিলো
জীবনের ছায়া
নেপথ্যের তথ্য তাই নয়ন সম্মুখে আসি রচে নব-মায়া,
যাহার ইঙ্গিত পেয়ে একবিন্দু জলকণা বারিধির এনেছে আভাস
নিঃসঙ্গ বালুকা সাথে সাহারায় উড়েছে বাতাস।
আমার মনসভী কাব্যের সুঠাম ছাঁদে চরণের করোনি সুন্দর
শিল্পের একান্ত সুরে প্রেমের মধুর রাগে কণ্ঠ মোর হয়নি মুখর।

আমি ভারতের কবি : আমার দেশের ভাষা
ইরাণের ভাষা কভু নয়
সুবঙ্কিম চন্দ্র আমি, পূর্ণ নয় আমার লেখন।

মাতার সুকণ্ঠ হতে যে ভাষা নিত্যই শুনি'
যদিও অমৃত সম লালিত্য তাহার,
উজ্জ্বল মধুর ছন্দে ইরাণের ভাষা রচে কাহিনী আমার–
আমার মানসকক্ষে সুন্দরের অগ্নি জ্বলে তাহার পরশে
আমার লেখনীমুখ শিখা হল জ্বলন্ত হরষে।

উত্তুঙ্গু ভাবের জ্যোতি চিন্তনের ক্ষেত্র মোর করেছে উজ্জ্বল
তাইতো ইরাণ সুরে কণ্ঠ মোর হইলো সজল।
পাত্রের স্বরূপ লয়ে তুলিও না বিতর্ক বৃথাই
সুরার সুরভি চাও– প্রয়োজন আজ শুধু তাই।

প্রথম পর্ব

অস্তিত্বের ব্যঞ্জনায় ব্যক্তি-রূপ রয়েছে উজ্জ্বল
প্রকাশ্য সকল তথ্যে আত্মার রহস্যকণা রয়েছে চঞ্চল
যখন জাগিলো আত্মার আলোক জ্বলে রক্তিম-প্রদাহে।
শতেক বাক্যের প্রাণ জেগে থাকে অন্তরে তাহার
ব্যক্তিত্ব-স্বীকৃতি আনে আত্ম-হীনে আলোক আবার।

আত্ম দেয় সংঘাতেরে নব-আমন্ত্রণ
দ্বৈতরূপে আপনারে এনে দেয় নব-আকর্ষণ,
আপনার একরূপ, অন্যরূপ কল্পিত আত্মার
আত্মা হতে গড়ে তোলে অপরের সুষমা-সম্ভার;
সংঘাতের তৃপ্তি চাই, তাই তার এ পরিকল্পনা
জীবনের রহস্যের নব-অভ্যর্থনা।

আপনারে হত্যা করা আপনার হাতে–
সেই তো শক্তির লভ্য জীবনের ব্যাপ্ত আঙ্গিনাতে–
অনুভব করে নেওয়া আপনার সামর্থ্য নিচয়
আনন্দের আলোকের, সত্য-সন্ধ জীবনের সেই হল নব-পরিচয়।
জীবনের তথ্য পায় আপনারে করি প্রবঞ্চনা
গোলাবের মতো গড়ে রক্তিম আলোকে তার জীবনের প্রমুক্ত কল্পনা
একটি গোলাপ লাগি' ভেঙে ফেলে উদ্যানের পূর্ণাঙ্গ আস্বাদ
একটি সুরের লাগি আদি-পথে গড়া হয় বহু আর্তনাদ।

একটি আকাশ লাগি' কত না নতুন চাঁদ
গড়া হয় নতুন প্রভায়
সহস্র বিতর্কজাল শুধু এক সঙ্গহীন বাণীর সহায়।
কেন এই অপব্যয়– নিষ্ঠুর ধরার মাঝে ব্যথার সঞ্চয়–
ধ্বংসের সঙ্কট গড়ে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের নব পরিচয়।
ব্যাকুলিত ফরহাদ কেঁদেছিলো শিরীণের লাগি'

কত না বেদনা স'য়ে তৃপ্তিহীন রাত্রি ছিলো জাগি'-
তা'র সে বেদনা কভু ব্যর্থ নয়, যেহেতু শীরিণ
অপরূপ সৌন্দর্যের স্বপ্ন মাঝে র'য়েছে বিলীন।
শতেক কস্তুরি-মৃগ ম'রে যাক, তাতে ক্ষতি নাই।
এককণা মৃগনাভি যদি কভু লভিবারে' চাই।
পতঙ্গ জ্বলিয়া মরে লেলিহান অগ্নির শিখায়
সে-মৃত্যু আনন্দময় অফুরন্ত প্রাণের ইচ্ছায়।

আত্মবিকাশে দীপ্ত হ'য়েছে বর্তমানের দিন
আগামী উষার দিগ বলয়ের ছবি রঙিন
ইহার শিখায় জ্ব'লে ছাই হোল ইব্রাহীমের কায়া
তাই দেখিলাম মুহম্মদের সব-প্রদীপের মায়া
কর্মের লাগি' আত্মা নিয়েছে কত বিচিত্র রূপ -
কভু বা কর্তা, কভূ বা বস্তু উপায়, কারণ কখনো বা নিশ্চুপ।
ব্যক্তিস্বরূপ জাগিয়া উঠিয়া আপনারে দেয় ছাড়ায়ে আকাশময়

প্রজ্জ্বলন্ত তাঁর রূপরাশি মাটিতে জাগায় অপরূপ বিস্ময়
তা'র পথে পথে স্বর্গ নেমেছে ধুলার আঙ্গিনা গড়ি'
নিরবধি কাল তাহার মাটিতে আসিয়াছে সন্তরি'।
নিকুঞ্জে তা'র যে গোলাব জাগে,
তাহা শুধু তার নয়
তারি' মাঝে আছে সারা বিশ্বের কুসুমিত পরিচয়;
রাত্রি তাহার তন্দ্রা হইতে,
জাগ্রত রূপে দিবস মেলেছে আখি-
দিনের বিলাস অঙ্গে জড়ায়ে ডানা মেলিয়াছে পাখি।

শিখা হ'তে তা'র ছড়ায়ে পড়িলো কত না অগ্নিকণা
প্রজ্ঞা শিখেছে তাঁর কাছ থেকে বিশেষের অর্চনা।
আপন সত্তা বিচূর্ণ করি' গ'ড়েছে অণুর হাসি
ক্ষণেকের লাগি' ব্যাপ্ত হইয়া সৃজিছে বালুকা রাশি।
ক্লান্ত-মধুর সুরভিত তনু রূপ নিলো এইবার

মর্মরময় পর্বত হ'ল পূর্ণ স্বরূপ তা'র।
আপনারে শুধু প্রকাশের লাগি আত্মা চেয়েছে প্রাণ
বস্তুকণায় তা'র রূপরাশি জ্বালিয়ে অনির্বাণ।

নিরাসক্ত সামর্থ্য যা রহিয়াছে আজো গতিহীন
শৃঙ্খলিত করি' কৃত্যা, কর্মমাঝে রহিবে বিলীন
যেমতি বিশ্বের প্রাণ দীপ্তি পায় আত্মচেতনায়
সে-প্রাণ শক্তির চিত্তে দোসর, সহায়।

যখন জলের বিন্দু ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায় হইবে উচ্ছল
আপনার ব্যর্থরূপ মুক্তসম হইবে উজ্জ্বল।
সুরার আকৃতি নাই, কেন না সে ম-ান আত্মহীন
পাত্রের অন্তরে গিয়া হইতে রঙ্গীন।
যদিও মদের পাত্র অতি রূপময়
মূল্য তা'র তখন অক্ষয়
ওষ্ঠের সান্নিধ্যে যবে পরিচয় যাবে তার জানা
তন্ময় মানব-চিত্তে স্বপ্ন দেবে হানা।

আপনি বিচূর্ণ হয়ে ধূলা হবে পর্বত যখন
লাঞ্ছিত মানস তা'র অভিযোগ আনিবে তখন-
সাগরের জল তা'র বক্ষোপরি' করে আনাগোনা
চিররাত্রি-দিন সেই কলোল্লাস যায় যেন শোনা ;
সাগর-তরঙ্গ যদি আত্মরূপ রাখি' অব্যাহত

নৃত্যোন্মাদ রূপে তা'র সমুদ্র-বক্ষকে যদি করে গো আহত
তখন বলিব তা'রে আরোহী উদ্দাম
চঞ্চল সমুদ্র সাথে ক'রেছে সংগ্রাম।
আলো হ'ল অক্ষিতারা সুন্দরের মধু অন্বেষণে,

কিশলয় পেল প্রাণ পুষ্পময় বনে
বিকাশের শক্তি পেয়ে চঞ্চল অস্থির
নবীন আকাঙ্খাদীপ্ত প্রাণবন্ত জীবন অধীর।

মোমের প্রদীপখানি সীমাতীত অণু দিয়ে ভরা
যাহারা সম্পৃক্ত হ'য়ে গড়ে নিলো আলোর পসরা-
তারপর ক্রমান্বয়ে আপনি গলিয়া গিয়া আত্ম হ'তে করে পলায়ন
সর্বশেষে দেখি তা'র অশ্রুর বিন্দুর মতো নব-রূপায়ণ।

অঙ্গুরীয়ের প্রস্তরাধার সংরক্ষিত নয়
তাই তো তাহার মনে জাগে সংশয়
হয়তো বা কভু নবীন আঘাতে দেহ হবে ভীতিহীন
যখন কাহারো নামের বোঝায় হবে সে ক্লান্ত দীন।
যেহেতু পৃথিবী আপন বক্ষে চিরকাল গতিমান
বন্দি চন্দ্র চারিদেকে তা'র অনন্ত অভিযান
চালায়ে আসিছে অনন্তকাল হ'তে-
শৃঙ্খলময় আপন প্রবাহ নিরবধি কালস্রোতে।

আবার দেখেছি এই পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমা
আবার দেখেছি নব - দিগন্তে জীবন-সম্ভাবনা
শক্তিমান-সে সৌরবলয়,পৃথ্বীরে তাই ক'রেছে আকর্ষণ
নব-প্রভাতের আলোকে তাদের নবীন সম্ভাষণ।
দেখেছি আমরা বীচবৃক্ষের মহিমা সে রঙ্গিন
আঁখিতে মোদের দীপ্ত হ'য়েছে সুতীক্ষ্ম সঙ্গিন
পর্বত হ'ল গরীয়ান তা'রে বুকেতে লালন করি'
আবরণ তার অগ্নিতে বোনা রক্তিম মঞ্জুরী;
বীজের গভীরে র'য়েছে তাহার প্রত্যয়শীল প্রাণ
সে-প্রাণপুঞ্জ নব-কামনায় জ্বলিছে অনির্বাণ।
জীবন যখন আত্ম হইতে সামর্থ্য নিলো
অপরূপ উল্লাসে
জীবনের স্রোত ব্যাপ্তি পাইল
সাগরের উচ্ছাসে।

দ্বিতীয় পর্ব

জীবন উদ্দেশ্য দ্বারা সংরক্ষিত আবদ্ধ মধুর
নির্দিষ্ট আদর্শ লক্ষে পৌছিয়াছে কাঁরাভার সুর
অনুসন্ধানের মাঝে রহিয়াছে জীবনের পূর্ণ পরিচয়
তার মুলীভূত তত্ত্ব সংগোপনে রাখিয়াছে আকাঙ্খা-নিচয়।

বাসনা প্রদীপ্ত রাখ অন্তরের রুদ্ধ দ্বারা খুলি'
তোমার ধূলির কণা মৃত্যুর দু'হাতে যেন
আপনারে নাহি দেয় তুলি'।

অন্তরের অন্তরীক্ষে যে কামনা পুঞ্জিভূত
সেই হ'ল ধরণীর প্রাণ
বস্তু-প্রকৃতির মাঝে নিভৃতে লুকায়ে আছে
আকাঙ্খার নব বাসস্থান।
হৃদয়ে চপল হয় কামনার স্পর্শ পেয়ে
প্রাণ-বীজকণা
তাহার উজ্জ্বল বিভা হৃদয়ে গঠন করে
দীপ্ত অগ্নিকণা।

নভোপানে উত্থানের সামর্থ পেয়েছে বিশ্ব
আকাঙ্খার কাছে।
সে হ'ল খিজির আর তুলনায় স্বল্প হ'ল
মুসা তার কাছে।
আকাঙ্খার অগ্নি হ'তে গড়া হয়
প্রাণের সম্ভার
অসত্য মরিয়া যায় যখন প্রদীপ্ত হয়
মানস-অঙ্গার।
মেলিতে পারে না পাখা আর কভু এ-পৃথিবী
পরিত্যক্ত হয় যবে আকাঙ্খার দান,

লুণ্ঠিয়া ধামে তাহার উদ্দাম গতি -
রহিত-উত্থান।

চিরজাগ্রত রহিবে আত্ম কামনার শিখা জ্বালি
আত্মার মহা জলকল্লোলে অশান্তি দিলো ঢালি'।
কর্ম্মগ্রন্থি বেধে রাখিয়াছে চঞ্চল তার মন!
আকাঙ্খার মৃত্যু হ'লে, মৃত্যু হয় মানব-জন্মের
উষ্ণতা কমিয়া গেলে নিভে যায় শিখ সব তাপিত বিশ্বের।

কোথা আছে উৎসমুখ আমাদের জাগ্রত চক্ষুর ?
কোথা আছে প্রাণতপ্ত বস্তুর অঙ্কুর ?
দেখার আনন্দ আজ প্রকাশিল বস্তুরূপে
দৃষ্টির গোচর।
তীরের দ্বৈত পদ রাখিয়াছে উৎস তার
চলার প্রেক্ষণ মাঝে অতি মনোহর ;
বুলবুল গাহিলো গান, আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে নব মূর্ছনায়।
চঞ্চু তার গড়া হ'ল সে-আনন্দ-মূল হ'তে নব ব্যঞ্জনায়।
নলবন হ'তে এসে একাকী একটি নল হইল বাঁশরী
সঙ্গীতের উৎস হ'ল বেদনা-আবরি।

মানসের মূল কোথা, যে-মন খুঁজিয়া ফেরে
নব প্রাণভূমি আর মৃত্তিকা আকাশ ?
আশ্চর্য আবেশে কেন প্রাণপুঞ্জে সন্ধানের এহেন আভাষ ?
জীবন উন্নত হয় কামনার পরশে নবীন
কামনা-জঠরে মন নব-সৃষ্ট ভ্রূণ-সম রয়েছে রঙ্গিন
সামাজিক নীতি আর নিয়ম-শৃঙ্খলগুলি
কোন বাক্য ক'রেছে প্রচার ?
বিজ্ঞানের তথ্যগুলি কোন মহাজীবনের আনে অঙ্গীকার ?
-কামনাই হোল সেই সত্যবাক্য- সত্যদীপ্ত বাণী
অন্তর-বাহিরে আসি' অন্তরের শুশ্রূষায় আনন্দকে
আনিয়াছে টানি।

দেহের প্রতিটি অঙ্গ সেই সঙ্গে আর
চিন্তন, কল্পনা আর ভাবনার পূর্ণ সমাহার
আত্মসংরক্ষণ লাগি' সৃষ্টি হইয়াছে -
রূপহীন সংঘাতের বার্তা আনিয়াছে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয় জ্ঞান-আহরণ
শিল্পের উদ্দেশ্য নয় তথ্য আমন্ত্রণ,
নিকুঞ্জ চাহেনি কভু কুঁড়ি ও কমল
বস্তুর লাবণ্য তা'রে করেনি চঞ্চল।
বিজ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল জীবন গড়িয়া তোলা সব রূপায়নে
বিজ্ঞান আনিয়া দেয় দীপ্তিকণা মানুষের মনে
নির্বান মনের কোণে শিল্প রচে ব্যাক্যের বাঁধুনি
শিল্প আর বিজ্ঞানের সুষ্ঠু সমন্বয়ে আমি জীবনের পদধ্বনি শুনি।

জীবন-তথ্য অজ্ঞাত আছে যদি কভু মনে হয়
জাগ্রত হ'য়ে অন্তরে আনো আনন্দ-সঞ্চয়
নব- চেতনায় বলীয়ান হ'য়ে পান কর সেই পানি
ন্যায়ের পাত্রে আদর্শময় জীবনের সন্ধানী-
এই আদর্শ আলোকোজ্জ্বল উষার দ্যুতির মতো-
জীবনক্ষেত্রে অগ্নিকণার প্রকাশ ইতস্তত
স্বর্গ থেকেও আরো মহীয়ান
এ-আদর্শের দান
মানুষের মন জয় করিবে সে, মুগ্ধ করিবে
আনিবে-সে কল্যাণ ;
অতীতের যত মিথ্যা র'য়েছে
সে তা'র ধ্বংসকারী
সংক্ষেপে তা'র পরিপূর্ণ মন
সংঘাত- সঞ্চারী।
জাগুক তোমার চেতনার মূলে প্রাণের অঙ্গিকার

জাগুক তোমার রাতের স্বপ্নে আনন্দ- ঝংকার
পান কর তুমি পানীয় সে রঙীন

পান পাত্রের উচ্ছলতায় সজল গউক দিন।
যদি তুমি কভু রাতের আঁধারে
একান্ত নিরালায়
নির্বাক মনে জেগে থাকো কোথা
জীবন-প্রত্যাশায়

আদর্শ বাণী জীবন্ত করো তুমি-
উষার আলোতে উজ্জ্বল হোক মনের ধূসর ভূমি।
আল্লাহর কাছে সে আদর্শের ভাতি হয়তো বা ম্লান
প্রকৃতির কাছে দীপ্তি তাহার আনিয়াছে কল্যাণ;

স্বর্গ থেকেও আলোকোজ্জ্বল রূপে
মানুষের মনে মোহন-স্বপ্ন আনিয়াছে চুপে চুপে।
বিজিত হ'য়েছে মানুষ তাহার কাছে
বশীকরণের যাদু তার জানা আছে
আকর্ষণের ক্ষমতা তাহার একান্ত সঞ্চয় ;
অতীত কালের জমানো মিথ্যা আর নয় অক্ষয় ;
সে ভেঙেছে সেই মিথ্যার কুহেলিকা
পৃথ্বীতে সেই জ্বেলেছে এবার প্রাণের নবীন শিখা।
সংঘাতে তার মনের আবর্তন
শেষ বিচারের রুদ্র দিনের জানালো আমন্ত্রণ।
ন্যায়-স্বচ্ছ নীতি আজ গড়িতেছি মোরা বারবার
এইতো জীবন বন্ধু, কামনার সূর্যালোকে
গড়িয়াছি আদর্শ সবার !

তৃতীয় পর্ব

মোদের মৃত্তিকাতলে যাহা আছে প্রাণের স্পন্দন
সে হ'ল আত্মার বিন্দু, প্রীতিক্ষেত্রে যা'র সঞ্চরণ
আয়ু তা'র দীর্ঘ হয়
অনেক জীবন্ত হয়-
অনেক জলন্ত আর অনেক উজ্জ্বল
প্রেমের অন্তর হ'তে শুরু হয় অস্তিত্বের চঞ্চল যাত্রার
নেপথ্যে অজ্ঞাত ছিলো নবতম সম্ভাবনা
প্রেমের আবর্তে তা'র দীপ্ত উদ্ভাসন।

প্রণয়ের ক্ষেত্রে হ'তে আগুন জ্বলিয়া উঠে আত্মার ইঙ্গিতে
বঙ্কিম কৃপাণে কভু প্রেম ত্রস্ত নয়
পানি হ'তে, বায়ু হ'তে অথবা মৃত্তিকা হ'তে তা'র জন্ম নয়।
শান্তি আনে অথবা সংঘাত হানে
জীবনের উৎস গড়ে
অথবা তুলিয়া ধরে মৃত্যুর সঙ্গিন
প্রেমের দৃষ্টিতে কাঁপে পাষাণের সুদৃঢ় প্রাঙ্গণ
বিভুপ্রীতি সর্বশেষে হ'য়ে যায় স্রষ্টা সর্বময়।
শিখে নাও প্রণয়ের রীতি
সান্নিধ্যে পাইবে প্রিয়তম
আয়ুবের মতো হোক তোমার অন্তর
নূহের মতোন হোক তোমার নয়ন!
তোমার মুষ্টিতে বদ্ধ মৃত্তিকার কণাগুলি
হোক সর্বময়
আদর্শ সাধকে তুমি প্রণতি জানাও।
রুমীর মতন তব প্রদীপ জ্বালাও
তাব্রিজের অগ্নি যেন অঙ্গার করিয়া দেয় রোমের শহর।
তোমার অন্তরতলে প্রিয়তমা রয়েছে গোপনে

যদি তব দৃষ্টি থাকে
আর তাহা তীক্ষ্ণ হয়-
তবে সে দাঁড়াবে আসি নয়ন সম্মুখে।
যারা তা'র প্রীতিকামী তা'রা কান্তিময়
তাদের মোহন রূপ এড়ালো সংশয়।
তার প্রতি বহিয়াছে সেই ভালোবাসা
তাহার প্রভাব হবে হৃদয় সুন্দর
আকাশ আনত হয়ে বরিবে পৃথ্বীরে।
সে-প্রভাবে দীপ্ত হ'ল সেই দেশ সেই তরুলতা
সেথা লাইলির প্রেমে আবেশে বিমুগ্ধ হ'ল
বিরহী মজনু।

যাহারা বিশ্বাসী আর যারা ধর্মানুগ
তাদের অন্ত হ'ল মসূলের ছায়া,
'মুহাম্মদ'- শুধু এই নাম
আমাদের গৌরবের উৎস রচিয়াছে।
সিনাই পর্বত তাঁর গৃহাঙ্গণ হ'তে আনা
ধূলি দিয়ে গড়া
কাবার গৃহের তীর্থ তাঁর বাসভূমি।
নিরবধি কাল তাও স্বল্প তাঁর সময়ের কাছে
অনন্তের ব্যাপ্তি হয় তাঁহার ইঙ্গিতে।
দুর্বাদল ছিল তাঁর শয্যার আসন-
কত খসরূর তাজ তাঁর অনুগামীদের পায়ে
হেলায় লুটায়,

রাত্রির গভীরে প্রভূ রচিলেন ধ্যানাসন হেরার গুহায়
একটি রাজত্ব আর নিয়ম-শৃঙ্খলা আর ন্যায়ের ভাষা
গড়িলেন সহজ প্রয়াসে।
কত রাত্রি কেটে গেল বিনিদ্র নয়নে-
অশেষ অনেক রাত্রি।

ইরাণের সিংহাসন যেন হয় বিশ্বসীর
এই ছিলো তাঁহার সাধনা।
যুদ্ধের মুহূর্তে তাঁর তরবারী আলোড়নে
লৌহ হ'ত গলিত তরল ;
ধ্যানের মুহূর্তে তাঁর নয়নের কেন্দ্র হ'তে-
ঝরিত বৃষ্টির মতো অশ্রু অবিরল।
আল্লাহর সাহায্য চেয়ে তাঁহার প্রার্থনা শুনি'
তরবারী উচ্চারিল আমিন, আমিন
সংহার করিল তাহা বহু নৃপতির শির
যা'রা ছিলো ন্যায়হীন অন্ধ ধর্মহীন।
অনেক নতুন নীতি
অনেক নিয়ম
মৃত্তিকার পৃথিবীতে এলো তাঁর বাণী নিয়ে
রচিল অক্ষয় দাবী;
প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি শেষ হল তাহার ইঙ্গিতে।

বিশ্বের গবাক্ষ তিনি খুলিলে ধর্মের আভায়
ধরণীতে আসে নাই কেহ তাঁর সমকক্ষ সমান নাই,
একাসনে ব'সেছেন গোলামের সাথে।
হাতেমতায়ের কন্যা যুদ্ধে বন্দি হ'য়ে
আসিলেন প্রভুর সম্মুখে ;
পদদ্বয় শৃঙ্খলিত শিরোদেশ আবরণহীন
মস্তক আনত তা'র লজ্জার প্রশ্রয়ে।
আপনার উত্তরীয়ে নবী সেই বিনীতা কন্যার
রচিলে আবরণ।
তায়েব কন্যার চেয়ে আমরা আরও নগ্ন,
বিশ্বের সবার সম্মুখে
আমাদের আভরণ নাই-
নাই কোন আচ্ছাদন লজ্জা ঢাকিবার।
শেষ বিচারের দিনে প্রভু আমাদের

রক্ষা করিবেন।
এ বিশ্বেও তিনি আমাদের
প্রথম, শেষের আর একান্ত আশ্রয়।

তাঁর ভালোবাসা আর তাঁর ঘৃণা ক্রোধ-
সব তাঁর করুণার দান ;
কোনোটা বর্ষিত হয় বন্ধুদের প্রতি
কোনোটা প্রযোজ্য হয় শত্রুদের প্রতি।
শত্রুর জন্যও প্রভু খুলিলেন করুণা-কপাট
কাবার শহর মক্কা রক্ষা পেল রোষবহ্নি হ'তে।
আমরা দেশের কোন সীমা চিনি নাই
দুইটি নয়ন হ'তে একক রশ্মির মতো আমরা সবাই।
হেজাজ, ইরাণ,চীন সব আমাদের

আমরা তাদের,
তবু আমরা সবে শিশির বিন্দুর মতো
হাস্যময় একটি উষার।
আমরা আচ্ছন্ন সবে মক্কার পাত্রধারীর দৃষ্টির ছায়ায়
আমরা একতাবদ্ধ মদ্য ও পাত্রের মতন।
প্রত্যেককে ভিন্ন সত্তা, বিশিষ্ট বংশের ধারা
সব তিনি চূর্ণ করিলেন
তাঁর অগ্নিতে জ্বলি' ভস্ম হ'ল জীবনের
তুচ্ছতম জীবনের সকল সঞ্চয়।
আমরা ফুলের মতো অনেক পাপড়িযুক্ত
অথচ মোদের প্রাণে একটি সুরভি;
তিনি এই সমাজের ছিলেন অনন্য আত্মা
আর তিনি যাপিলেন সর্বরূপে একক জীবন।
মোরা তার অন্তরের সুগোপন গূঢ়তথ্য ;
দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি জানালেন আপন ভাষণ,
আর এই পৃথিবীতে পরিব্যক্ত হইলাম আমরা সবাই।

আমার নীরব বাঁশী পরিপূর্ণ তাঁর জন্য
তাঁর প্রতি নির্দেশিত প্রণয়-সঙ্গীতে,
আমার অন্তরে কাঁপে সহস্র সুরের রেশ।
নিবেদিত চিত্ত হ'তে যে-ভক্তি উচ্ছ্রিত হয়
ব্যক্ত তাহা হইবার নয়।
একটি নীরস কণ্ঠ কেঁদেছিলো তাঁর জন্য বিয়োগ ব্যথায়।
সত্যাশ্রয়ী মুসলিম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়
রসূলের গৌরবের বিচ্ছুরিত রশ্মিগুলি নিয়ে;
অনেক সিনাই চূড়া গড়া হয়েছিলো
তাঁহার পথের ধূলি নিয়ে।
তাঁহার দর্পণ হতে গড়া হল আমার মূরতি
তাঁহার বক্ষের সূর্যে দীপ্ত হল আমার প্রভাত।

আমার বিশ্রামে আছে অনন্ত সংঘাত,
আমার সন্ধ্যায় আছে অনেক উষ্ণতা
শেষ বিচারের উষা যার কাছে অনেক মিলন
তিনি দিবসের মেঘ আর আমি নিকুঞ্জ তাহার
আমার দ্রাক্ষার কুঞ্জ সিক্ত হ'ল তাহার বর্ষায়।
প্রেমের ভুমিতে আমি রোপিলাম আমার নয়ন
অন্তরের দৃষ্টি মোর তীক্ষ্ণ হল
খুব তীক্ষ্ণ হল।
দুইটি জগত হতে মদিনার মাটি মধুময়
যেখানে তাহার বাস ধন্য সে নগরী!

জামির রচনারীতি আমার অনেকবার মুগ্ধ করিয়াছে
আমার আচ্ছন্ন ভাষা অনেক বিশুদ্ধ হ'ল
তাঁহার কৃপায়।
উচ্ছ্বসিত আদর্শের অনেক ইঙ্গিত আছে
তাহার বাণীতে
প্রভুর প্রশংসা করি গেঁথেছেন কাব্যের মালিকা-

"মুহম্মদ এ-বিশ্বের মহাগ্রন্থে' ভূমিকাস্বরূপ
সমস্ত জগৎ-ভূমি বিনীত তাহার আছে
দাসের মতন-
তিনি সকলের প্রভু।"
প্রেমের শরাব হতে উচ্ছ্বসিত হয় বহু আত্মিক ক্ষমতা;
প্রেমের নীতিতে আছে অন্ধ উপাসনা।
বোস্তামের বায়েজিত একটি বিশেষ ফল গ্রহণ করিতে
নিরত হলেন
কেননা তাহার মনে এ 'সন্দেহ দৃঢ়তর হল
হয়তো বা এই ফল আসেনি প্রভুর প্রয়োজনে।

দ্বিধাহীন উপাসক হও তুমি প্রিয়ার নিকট-
স্রষ্টার সান্নিধ্য পাবে নিশ্চিন্ত এ-বন্দনার পথে।
অন্তরের হেরা-গুহা হোক ক্ষণিকের লাগি তোমার আশ্রয়
আত্ম পরিহার করি' যাও তুমি স্রষ্টার সন্ধানে।
স্রষ্টার প্রভাব হতে শক্তিমান হইয়া আবার
ফিরে এসো আপনার অন্তরের কাছে;
ভেঙে ফেলো তাহাদের শির
কামনার অন্ধকূপে যাহারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে।
প্রেমের সামর্থ্যে তুমি যোদ্ধাবৃন্দ কর সংগঠন
আপনারে ব্যক্ত কর প্রণয়ের কাছে
যে প্রেম আকাশচুম্বি পর্বতের মতো।
আমাদের মহাপ্রভু স্রষ্টা জ্যোতির্ময়
তোমারে উদ্দেশ্য করি জানালেন মহাগ্রন্থে ভাষণ অক্ষয়,
"আমার প্রতিভু আমি ধরনীতে করিব নিয়োগ।"

অনুবাদ ঃ সৈয়দ আলী আহ্সান

প্রার্থনা

এই মোর ওজু, এই নামায আমার,
মোর সঙ্গীতের সুরে আছে মোর হৃদয়- শোণিত।
পুণ্যাত্মা সূফীর সঙ্গ, সে যে স্বর্গসুখ,
দিব্যজ্যোতি, সাযুজ্য পরম।
নির্ঝরের পাশে ফুল্ল- লালা যথা স্ফূর্ত প্রাণ
আনন্দ-বিহ্বল।

প্রেম-সরণিতে কারো সঙ্গী কেহ নয়;
রয়েছে আমার সাথে শুধু মোর বাসনা উদ্দাম।
নৃপ কিম্বা সামন্তের সিংহাসনে স্থান মোর নহে-
তুমি মোর নীড়, মোর নীড়ের আশ্রয়-শাখা তুমি।

তব প্রেমে ছিন্ন মম বক্ষোবাস
প্রলয়-উষার মুক্তি দিগ্বলয়-সম ;
তব তরে 'আল্লাহর' অগ্নি জ্বলে আমার অন্তরে।

তব তরে এ জীবন অগ্নিময়, ব্যথাদীর্ণ,
বেদনা-বিক্ষত ;
আমার কামনা তুমি, ধ্রুবলক্ষ মোর।
তুমি না থাকিলে কাছে, মোর সারা শহর বিরান ;
তুমি যদি থাক, পূর্ণ উজাড়-মহল,
মুখরিত বিজন-বসতি।

আমার অধরে দাও পুনঃ সেই পুরাতন সুরা ;
মোর পানপাত্র ভেঙে আমি
সে- সুরার করি অন্বেষণ।

সংসারী ও সন্ন্যাসীর করপাত্র বহুকাল শূন্য প্রতীক্ষায় ;
দৃষ্টিসুধা দাও সাকী, কৃপা করো তাহাদের 'পরে।
তব 'খুদায়ীর' কাছে প্রমত্ত মনের মম এই অভিযোগ-
তুমি ব্যাপ্ত অসীমায়, আমি বন্দী সীমার বাঁধনে।
কামনার যেই বাণী অপরোক্ষে নাহি যায় বলা,
দর্শন ও কবিতার সত্য নয় ব্যতিক্রম তাঁরা।

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদির

পাঞ্জাবের কৃষকের প্রতি

তোমার অস্তিত্ব বর কি সে, কি গূঢ় রহস্য তার
শতাব্দীর ইতিহাস হারিয়েছে পথের ধূলায়
নিভেছে তোমার শিখা সে ধূলোর গাঢ় অন্ধকারে
এবার জাগার পালা ডেকে যায় ভোরের মিনার।
মাটির মানুষ পারে মাটি থেকে আহার জোটাতে
কিন্তু প্রাণ নির্ঝরের ক্ষুধা সেতো পারে না মেটাতে
দেখেনি যাচাই করে যে কখনও আপন সত্তারে
এ জগতে নাম তার কতটুকু, দামই বা কী তার।
মূর্তি যত চূর্ণ হোক ধর্ম গোত্র জাতের মন্দিরে
সে প্রচীন নীতি শাস্ত্র মানুষকে বেঁধেছে জিঞ্জিরে
ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে অচিরে
সারা দুনিয়া লোক বাঁধা রবে মৈত্রীর বাঁধনে।
সেইতো চরম জয়, সে বিশ্বাস শক্তি আনে মনে
ছড়ায় আত্মার বীজ মাটিতে তোমায় ভালবেসে
আগামী কালের দীপ্ত আশ্চর্য ফসল ফলাবে সে

অনুবাদ ঃ আবুল হোসেন

চয়ন

ইকবাল স্মরণে রচিত কবিতাবলী

ইকবাল

গোলাম মোস্তফা

ধর্ম যখন গতিহীন হয়, আত্মায় নামে নিদ
সেই দুর্দিনে আসে দুনিয়ায় নবী ও মুজাদ্দিদ।
দীনের চেরাগ জ্বলে ওঠে ফের - গ্লানি-পাপ হয় দূর
কেটে যায় মেঘ, হাসে চাঁদ-তারা, প্রাণে বাজে নব সুর।
কাব্য-লোকেও আসে সেই মত আলো ও অন্ধকার
অবসাদ আর জড়-চিন্তার মেঘ নামে বার বার।
সেই কালো রাতে কউমের মাঝে আসে কউমের কবি
আনে নব সুর-নব-পয়গাম, এঁকে যায় নব ছবি।
ভুল ভেঙে যায়, পথহারা জাতি পায় পথ-নির্দেশ
হয় তার প্রাণে নবজীবনের চেতনার উন্মেষ।
তুমি সেই কবি-ইকবাল-তুমি মূর্ত আশীর্বাদ
তুমি এলে নেমে মুসলমানের ঘুচাইতে অবসাদ।
তুমি এলে আল-হিলালের খঞ্জর নিয়ে হাতে
খুদীর যুদ্ধে প্রস্তুত হলে খোদ যে খোদার সাথে।

আল্লাহর নামে রচিলে 'শেকোয়া'-নির্ভীক নির্ভয়
হুঁশিয়ার করে দিলে তুমি তাতে-সহজ কথা সে নয় !
কহিলে তাহারে "এয় খোদা, তোর -এই কি ন্যায় বিচার !
তোর নামে মোরা সব ঢেলে দিনু -এই পরিণাম তার ?
আগুনে পুড়েছি, সাগরে ডুবেছি, দিয়েছি তপ্ত খুন,
তোর প্রেমে মোরা পাহাড় কেটেছি -হইয়াছি মজনুন।

দরাজ কণ্ঠে ঘোষিয়াছি মোরা 'আল্লাহু আকবার'।
লা-শরীক তুই, তোর ছাড়া কেউ মা'বুদ নাহিক আর।
তোরে কে চিনিত ! তোরে কে মানিত ! জানিত কে তোর নাম
আমরাই তোর মান বাড়িয়েছি দিয়েছি তোর যা-দাম।

তারি এ নতিজা ! দুনিয়ায় মোরা হৃত-বঞ্চিত আজ !
কৃতজ্ঞতা কি নাই কিছু তোর ! নাইক শরম লাজ
তোরে যারা দিল শত-লাঞ্ছনা-শত গ্লানি অপমান
ধন-দৌলত-মান-ইযযৎ তাদেরই দিলি দান !
'বেহেশত ও 'হুর-পরীদের ওয়াদাই শুধু সার ?
হবে না তা, তোরে দিতে হবে বুঝে আমাদের অধিকার
দাবী করা দান নিব আজি মোরা -ভিক্ষা চাহি না আর !"

ফরিয়াদে তব কাঁপিয়া উঠিল আল্লাহর দরবার
দিতে হল তারে মুখ ফিরাইয় "জবাব" সে 'শেকোয়ার'-
"এয় কবি, তুমি মিছে কেন মোরে বদনাম দাও হায়,
আমি কি জাগাই কারেও-যদি সে নিজে না জাগিতে চায় ?
ইসলাম সে ত কিতাবে রয়েছে, মুসলমান ত নাই !
আত্মা তাদের মরিয়া গিয়াছে-হতভাগা তারা তাই !
জাগে যদি ফের আত্মা তাদের -হয় যদি আগুয়ান
অপরের মত তারাও পাইবে আমার সকল দান।"
"আসরারে খুদী" শুনালে তখন শুনালে নতুন বাণী
গোসল করালে আমাদেরে তুমি আবে-যমযম আনি
নবজীবনের শক্তিমন্ত্র কানে দিলে আমাদের
"আমি আছি" বলি গর্জিয়া ওঠ, ওরে ও সুপ্ত শের !
'খুদীর' শক্তি - সেই ত শক্তি- খুদী ছাড়া কিছু নাই
খুদী যার যত বড় সেই তত বিরাট বিপুল ভাই !

তোমার সে নব জীবন-মন্ত্রে জাগিল মুসলমান

দলে দলে এল বীর মুজাহিদ-মুক্তি-পিয়াসী প্রাণ।
এল সেনাপতি 'কায়েদে-আযম' মূর্ত প্রতিভা-নূর
যত সংশয়-সন্দেহ-ভয়-সব হয়ে গেল দূর।
চলিলে তখন সম্মুখ পানে নিয়ে নব অভিযান
কোথায় মোদের আপন ওতন! মনে প'ল এই জ্ঞান।

অমনি তখন বলিলে খোদায় ঃ এয় খোদা, কেন নাই
ওতন মোদের ! যে রূপেই হোক-ওতন মোদের চাই!
মোরা মুসলিম তৌহিদবাদী-আজাদ মোদের প্রাণ
আমাদেরে দাও পাক-পবিত্র আজাদ-পাকিস্তান!
ধ্যানের তুলিতে এঁকে দিলে তুমি পাকিস্তানের রূপ!
শস্য-শ্যামলা শ্যাম-কুন্তলা স্নিগ্ধ সুরঙিন
মিনারে মিনারে আযান দিতেছে ভোরের মোয়াযযিন।
অধীর আবেগে দাঁড়াইয়া আছে যমিন ও আসমান
জান্নাত হ'তে চেয়ে আছে যত হুর-পরী গোলেমান।

নিমেষের মাঝে হিন্দুস্তান হয়ে গেল দুইখান
তারি বুক চিরে বাহির হইল সোনার পাকিস্তান।
মাটির মায়ের বুকে জেগে ছিল যে পাক মেয়ের সাধ
মিটে গেল তাহা-ঘুচে গেল যত নিরাশার অবসাদ!
সূর্য তাহারে সালাম জানালো, গেয়ে গেল বুলবুল
দিকে দিকে ছোটে মৃদু সমীরণ, বনে বনে ফোটে ফুল!
'ঝিলামের' বুকে 'কর্ণফুলী'তে এল ফের নব বান
মাঠে মাঠে আজ দোলা লাগে-নাচে সবুজ পাট ও ধান!

এল নব দিন, নব জাগরণ, উঠেছে নূতন রবি
প্রভাতের গান গেয়ে চলে গেছে মোদের চারণ কবি
মরেছে সে? না, না, মরে নাই সে ত! মৃত্যু নাহিক তার!
তার সুর-তার প্রাণ-বাণী আজো শুনিতেছি বার বার!

আজো তার সাথে খোদা কথা কন-হয় বাণী বিনিময়
'বালে জিবরিল' জানাজানি করে গোপন সে পরিচয়।
আমরা যে আজ আজাদী পেয়েছি-গেয়েছি পাকিস্তান
ছিনায়ে এনেছে ইকবাল তাহা-মহান খোদার দান!

এমনি করিয়া কেড়ে নিতে হয় আল্লাহর নিয়ামত
যোগ্য জনের পরেই আল্লাহ দেন তাঁর রহমত!
ইকবাল যদি আল্লাহর কাছে মাঙিত শুধুই ভিক
খোদা নিশ্চয়ই জবাব দিত না -চুপ করে রত ঠিক!

শেকোয়ার জোরে ফিরে গেছে আজ কউমের কিসমৎ
আপনার পায়ে দাঁড়ায়েছি -তাই পেয়েছি এ সম্পদ!
ফের বার যদি হুঙ্কার দিয়ে জেগে উঠি যত বীর
পাকিস্তানের মতই পাইব ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর!
হারায়েছি যাহা-সব ফিরে পাব - 'আলহামরা' ও তাজ!
নব-গৌরবে দূর হবে যত অপমান-যত লাজ!
জীবনের কবি, আত্মার কবি, আল্লামা ইকবাল
তসলিম লও, আমাদের মাঝে বেঁচে থাক চিরকাল!

স্বরণী

শাহাদৎ হোসেন

তোমারে স্বরণ করি–
নব-যুগ-প্রভাতের সার্থক চারণ!
জাতির জীবন-পন্থে
অনির্বাণ আলোর দিশারী
দ্রষ্টা ধ্যানী তাত্ত্বিক তাপস
তোমারে সালাম করি।

জন্মের প্রভাতে তব
পূর্বলে উদয়-সবিতা
জয়টীকা এঁকে দিল ললাটে তোমার।
পঞ্চনদী- শতদ্রু-বিপাশা
ইরাবতী-চন্দ্রভাগা-বিতস্তা উল্লোল
কল্লোলে আগম তুলি'
আবির্ভাব ঘোষিল তোমার।
সাধনার বেদীমূলে স্তিমিত নয়ান
দুর্গম রহস্য-পন্থে
গোপন মানস-চারী
আত্মতত্ত্বে আলোর সন্ধানী,
'পরিন্দের ফরিয়াদে'
'শেকোয়া'য় মানবের চিরন্তন মর্ম-অভিযোগে
নিখিলের প্রাণ-কেন্দ্রে আলোড়ন তুলি
উদাত্ত বাণী মন্দ্রে
দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষিলে জবাব।
অপরূপ ছন্দোগাথা

দেশ-কাল পাত্র অতিক্রমি'
অনন্ত ব্যাপ্তির মাঝে
লভিয়াছে অরূপের রূপ।

কোথা চীন- আরব্য কোথায়
শ্যামায়িত দিগন্তের হিন্দুস্তান কোথা-
সিন্দু-মরু-গিরি-দরী কান্তার তটিনী
সর্ব-ব্যবধান ভেদি'
অনন্ত জাহানে তুমি সর্ব-একাকারে
রচিয়াছ আপনার অভিনব চিরন্তন নীড়।
সে-নীড়ের দূর-প্রান্তে
পদ্মা-মেঘনা-যমুনার শ্যামলিমা-কূলে
ক্ষীণ-কণ্ঠ আজি
গাহিতেছে প্রশস্তি তোমার।

আজিকার এ- স্বরণী হোক চিরন্তনী--
প্রতি বর্ষে এই পুণ্য দিনে
তোমার বাণীর পূত অন্তর্বহা সঞ্জীবনী-ধারা
নবতন উজ্জীবনে
উজ্জীবিত কোরে দিক জাতির জীবনে।
যুগ-স্রষ্টা দ্রষ্টা ধ্যানী
হে সার্থক কবি
তোমার স্বরণ- ক্ষণে
এই মোর মরমের একান্ত আকুতি।

শেকোয়ার কবি

বেগম সুফিয়া কামাল

'শেকোয়ার' কবি! সালাম জানাই তোমারে স্বরণ করি'।
তুমি নাই আজ, তোমারই গানে উঠেছে ভুবন ভরি।
হাজারো মুখের ভাষা ফুটিয়াছে, হাযারো কণ্ঠে গান
ফুটায়েছ তুমি, লাখো অন্ধেরে করেছ দৃষ্টি দান।
পূর্ব-অচলে উদিয়াছে রবি জানেনি রুদ্ধ দ্বার ;
খুলিয়াছ তুমি - হাতে নয়, গান গাহিয়া বারংবার।
তব উদাত্ত কণ্ঠের গানে খুলিয়াছ দ্বার-আঁখি,
প্রাচ্য-প্রতীচি হাতে বাঁধিয়াছ সাম্যগীতির রাখী।
প্রাণধারা তব পঞ্চনদের খরস্রোত বেগ সম
কত যে উষর মরু-বক্ষেরে করিয়াছে মনোরম,
সারা জাহানের সাথে যোগ করি' বহায়েছ প্রাণধারা,
ভারত, আরব, চীন ভরি' তাই উঠিয়াছে আজ সাড়া।
মহান মানুষ! বড় আদরের ধরণীয় হে দুলাল!
কোথা তুমি আজ? সত্য-সাধক! 'শেকোয়ার' ইকবাল!
মূর্ত করেছ, বাণীতে আপন, হে প্রতীক বেদনার!
'শেকোয়া'য় সব মানবাত্মার বুকভরা হাহাকার
পাঠাইয়াছিলে বড় অভিমানে কাঁদিয়া যাহার কাছে,
তাহারই কাছে গিয়াছ জানিতে জবাব কী এর আছে!
বড় বেদনায় বড় অভিমানে কেঁদেছিল তব প্রাণ,
বারবার তাই ফরিয়াদ করি' হয়েছিলে হয়রান।

স্রষ্টা সে বসি সৃষ্টি-আড়ালে জাগিয়া তোমার প্রাণে,
জবাব তোমার দিয়াছিল কবি! তোমারই প্রাণের তানে।
তারি সুর ফুকি করিল বিধুর, করিল সে উন্মন।
সহিলে না তাই এই ধরণীর ভুলে-ভরা বন্ধন!

মৃত্যুরে জিনি দিল উপহার মহৎ তোমার প্রাণ!
ধরণীরে শেষ দান দিয়া গেছ মরণজয়ী সে গান

নয্‌রানা
আজহারুল ইসলাম

নিরন্ধ্র রাত্রির বুকে তুমি ছিলে জ্যোতির কণিকা,
আমাদের আকাশেতে দিলে তুমি আলোর সন্ধান,
তোমার কল্পনা দিলো জাতির-ভালো সম্মানের টীকা,
সঞ্জীবনী শক্তিমন্ত্র জাতিরে করেছ তুমি দান।

তোমার কবিতা পাঠে একদিন মেতেছিলো জাতি,
নতুন নির্দেশে হলো সেইদিন পথ চলা সুরু,
তাইতো বসেছে তুমি জাতি-বুকে সিংহাসন পাতি,
সর্ব পাকিস্তান আজ মেনেছে তোমারে তাই গুরু,

খুদির তত্ত্বের মাঝে আমাদেরে তুমি দীক্ষা দানি
শিখায়েছ সুপ্তদেহে কেমনে জাগাতে হয় প্রাণ,
তোমার লেখনী মাঝে পাই-তাই জেহাদের বাণী,
অদ্ভুত তোমার ভাষা, মনে হয় শানিত কৃপাণ।

শক্তির পূজারী ছিলে তাই তুমি কর্মবাদে মাতি,
সচেতন করেছিলে পাদপিষ্ট আপন সত্তারে,
খুদীর ঝঙ্কারে তাই ধন্য হলো সারা দেশ জাতি,
সুগম্ভীর ধ্বনি তাই শুনেছিনু অরণ্যে পাহাড়ে।

ইকবাল প্রয়াণে

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

জানি না তোমার ভাষা ওগো কবি, তবু ভাষান্তরে
পশিছে শ্রবণে মোর তোমার বাণীর প্রতিধ্বনি;
তোমার চিন্তার মাঝে না জানি কি আছে স্পর্শমনি,
বিভাষা ভাস্বর হয়, নয়নে কনক দীপ্তি ধরে।
শুনি বিজ্ঞানীর মুখে- রেডিয়াম বিকীরিত করে
বিজলীর অনুকণা; নিথর ইথার শিহরণি
তোলে তার ঘূর্ণীচক্র; বিস্ফুরিত হতেছে তেমনি
তোমার চিন্তার ঢেউ মৌনঘন আমার অন্তরে।
প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের যেথা যত সংকীর্ণ প্রাচীর
তোমার উদাও রবে পড়ে ভাঙ্গি তরুণের প্রাণে,
আগামী যুগের নবী তুমি যে নবীন হিন্দুস্থানে
-সে বাণী অকুতোভয়ে ঘোষণা করেছে তুমি বীর
উদ্বোধনী গানে গানে -তাই আজ হিন্দু-মুসলমান
যুক্ত করে তুলে ধরে স্বাক্ষরিত তোমার নিশান।





চিন্তাশীল আল্লামা ইকবাল



যৌবনে আল্লামা ইকবাল

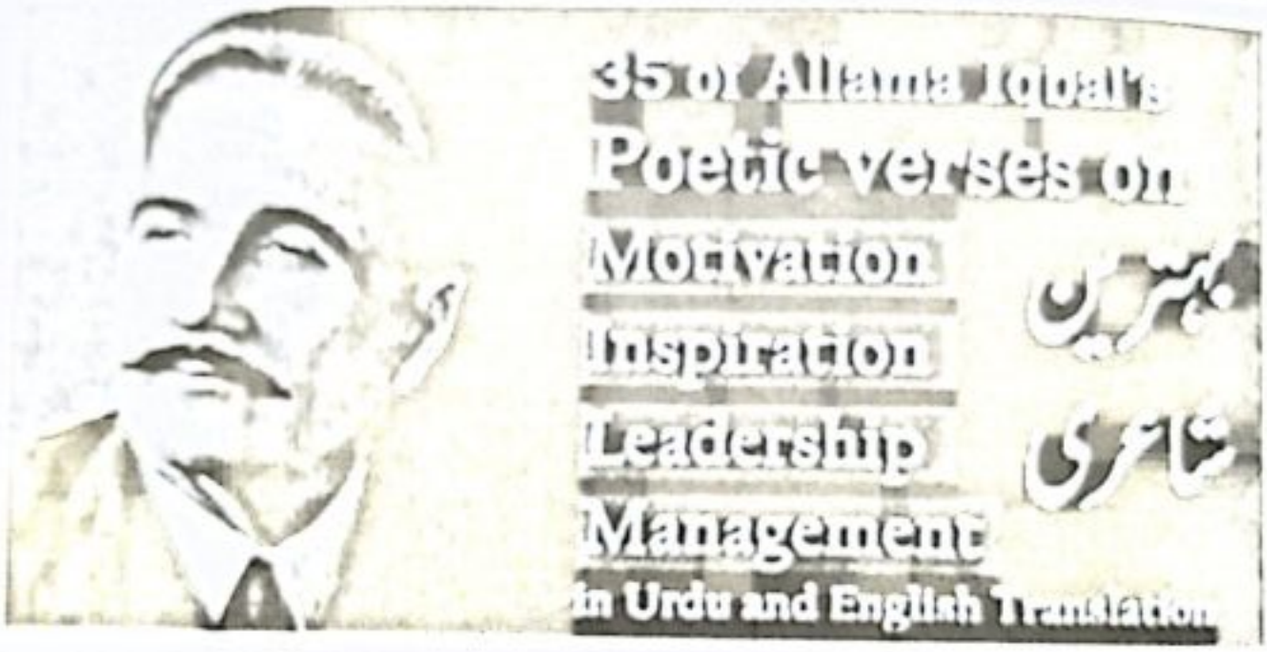


কোরআন শরীফ পাঠরত আল্লামা ইকবাল



প্যারীসে আল্লামা ইকবাল

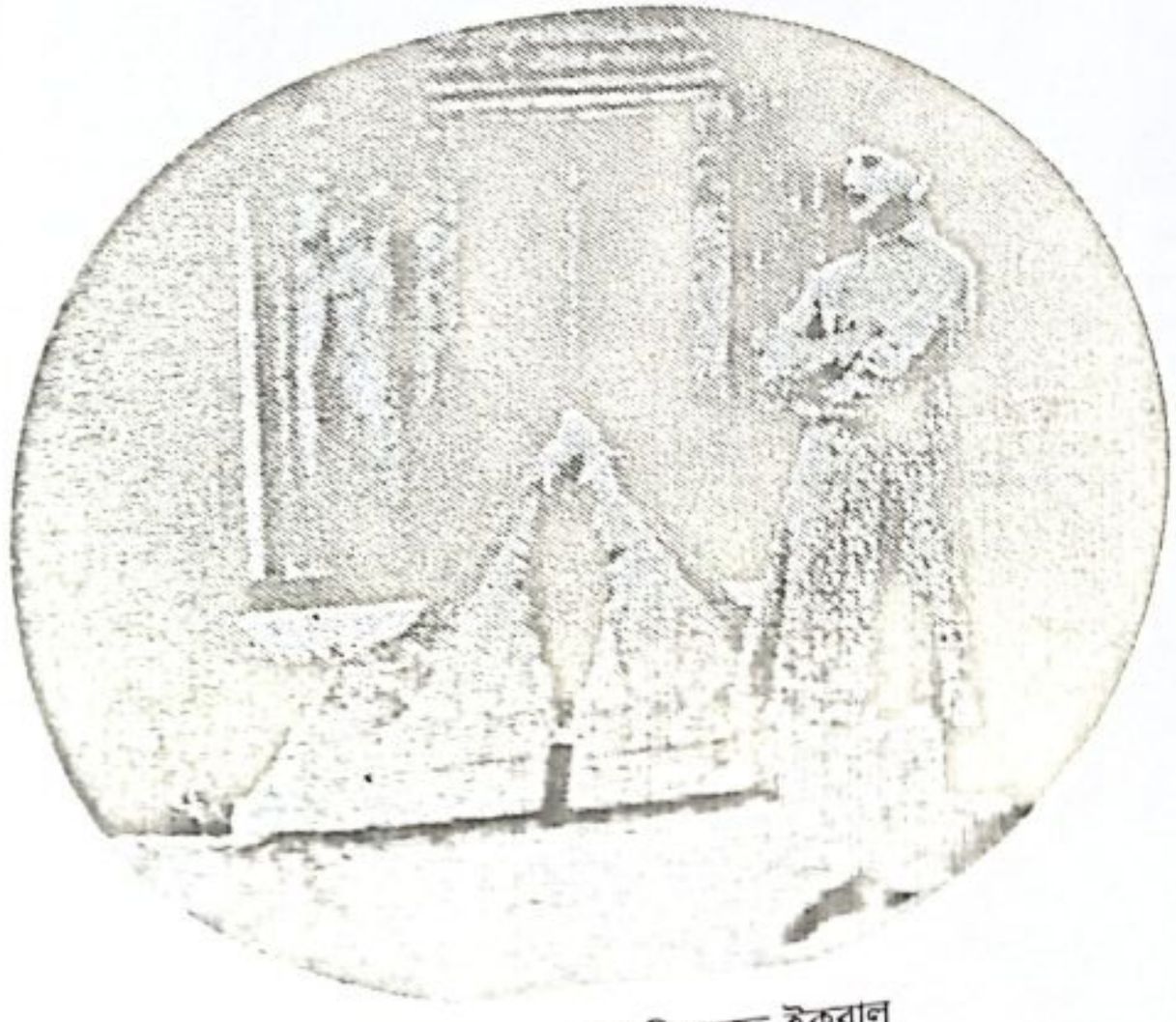



35 of Allama Iqbal's
Poetic verses on
Motivation
Inspiration
Leadership
Management
in Urdu and English Translation





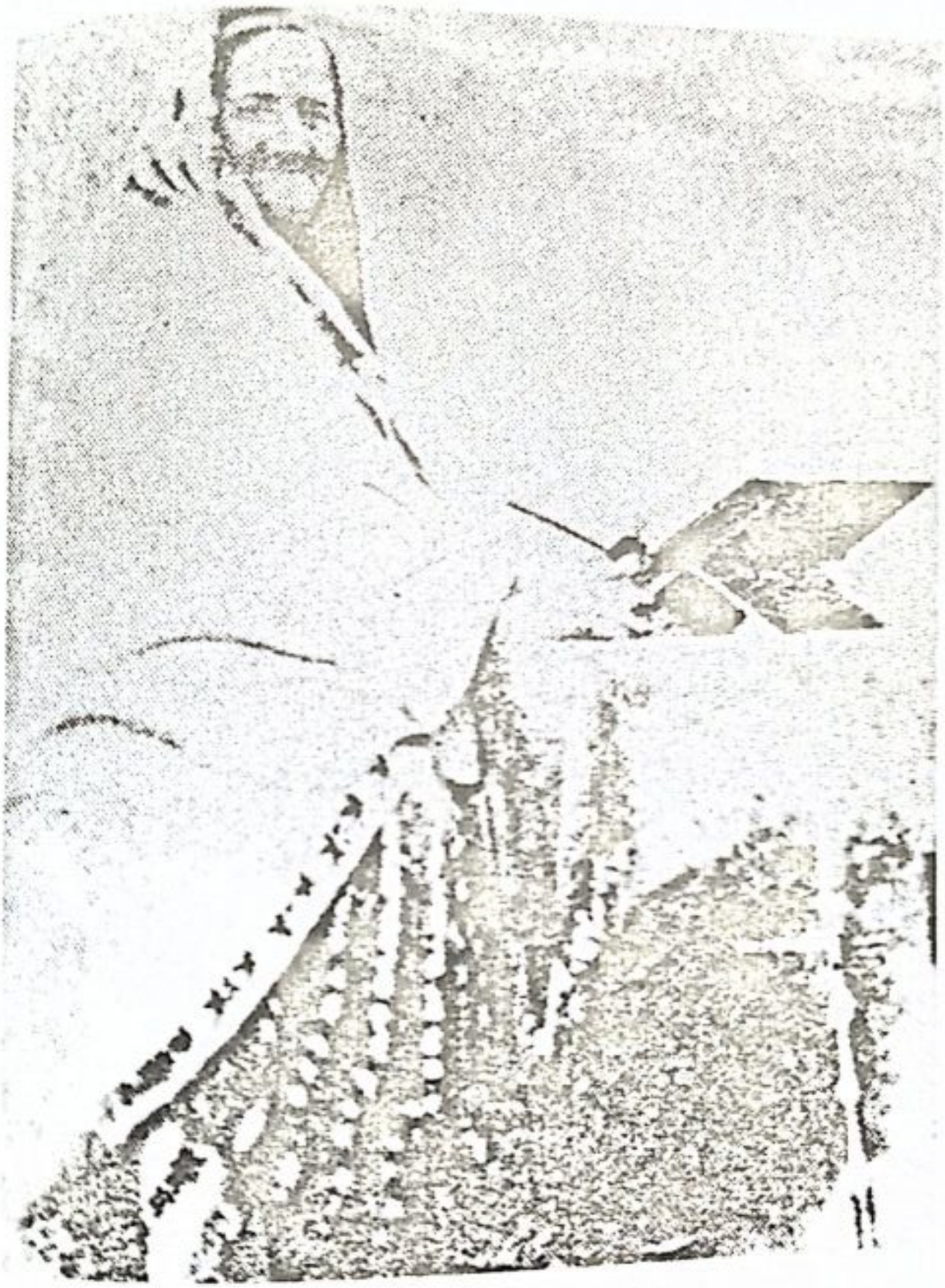
নামাজ পাঠরত আল্লামা ইকবাল



টিপু সুলতানের মাজার যিয়ারতে ইকবাল



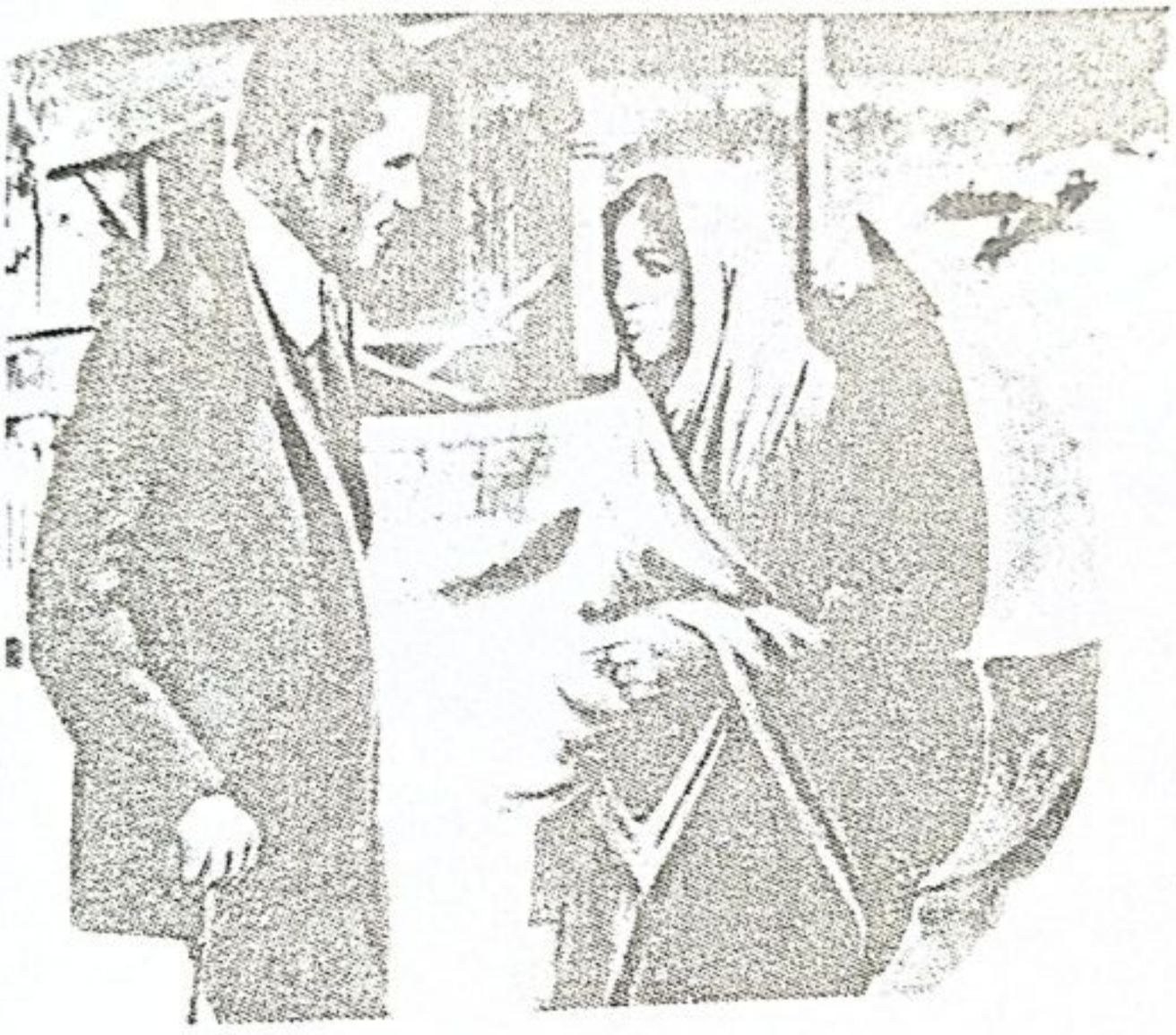
ইকবালের বাবা শাইখ নূর মুহাম্মদ



ইকবালের মা বেগম ইমাম বিবি



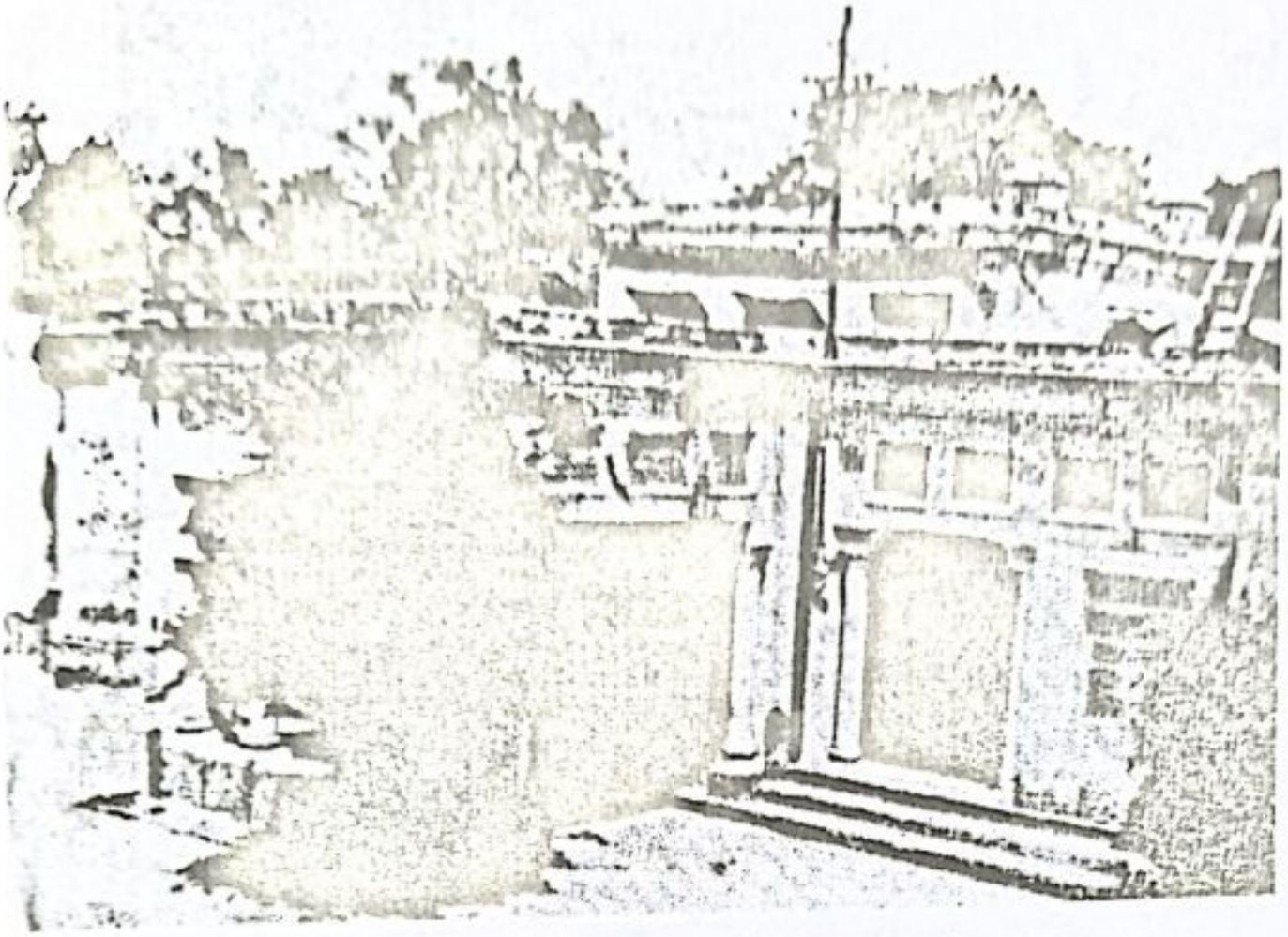
ইকবালের সাথে পুত্র জাবেদ



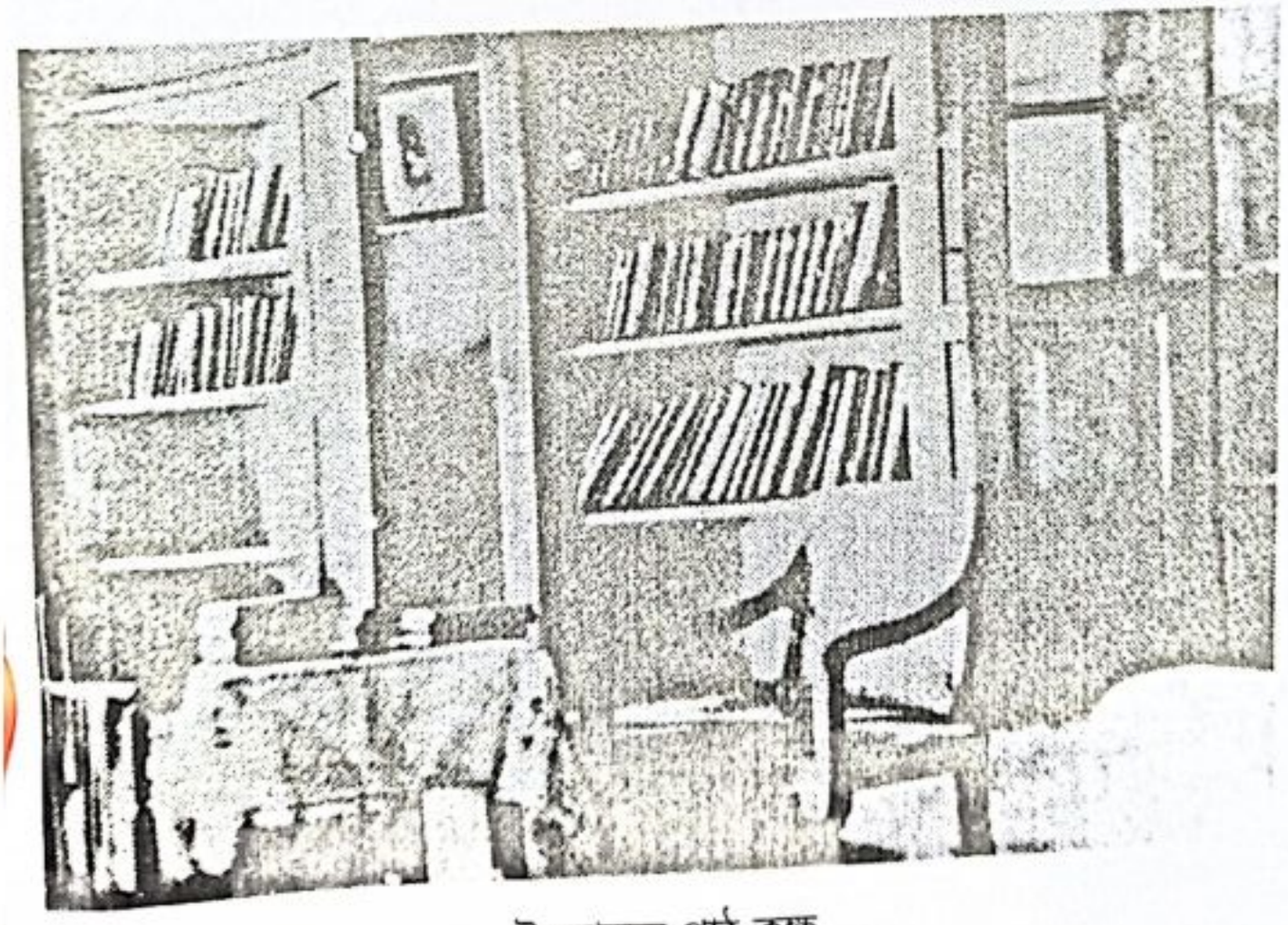
স্ত্রী আতিয়া ফয়জীর সাথে ইকবাল



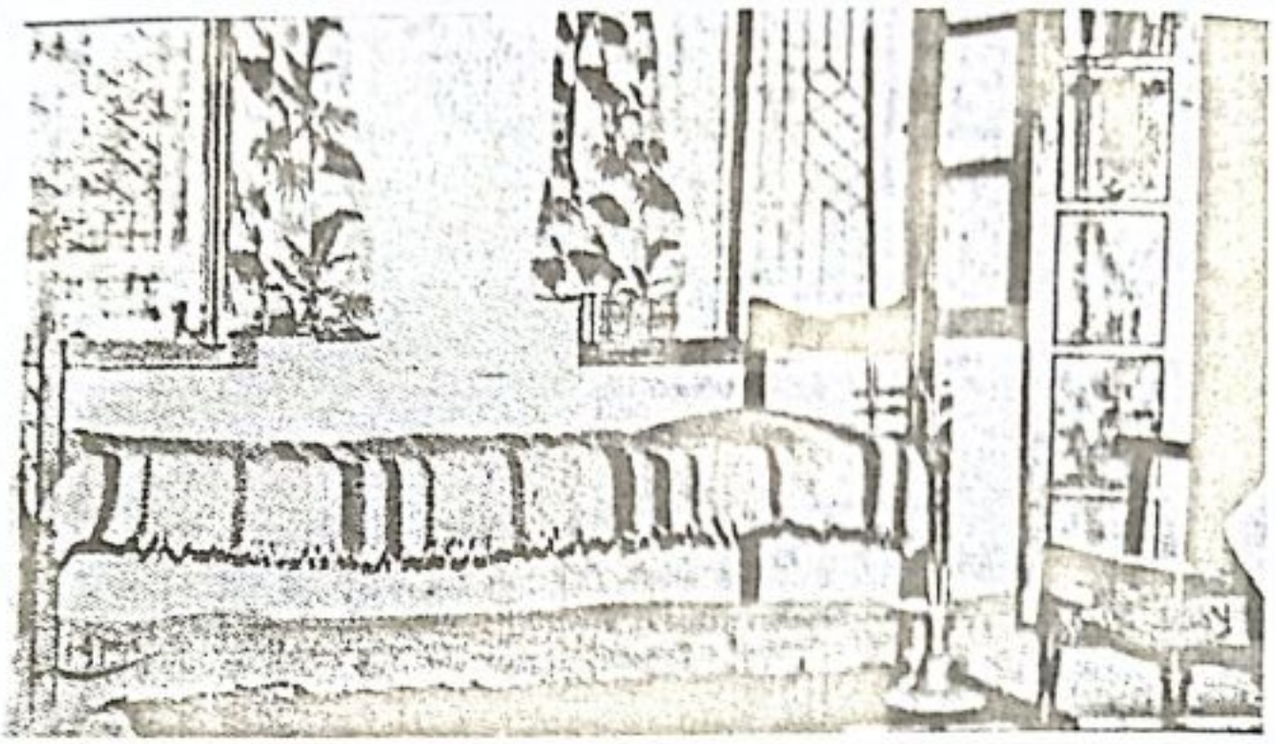
ইকবালের শিক্ষক– হযরত দাগ দেহলবী



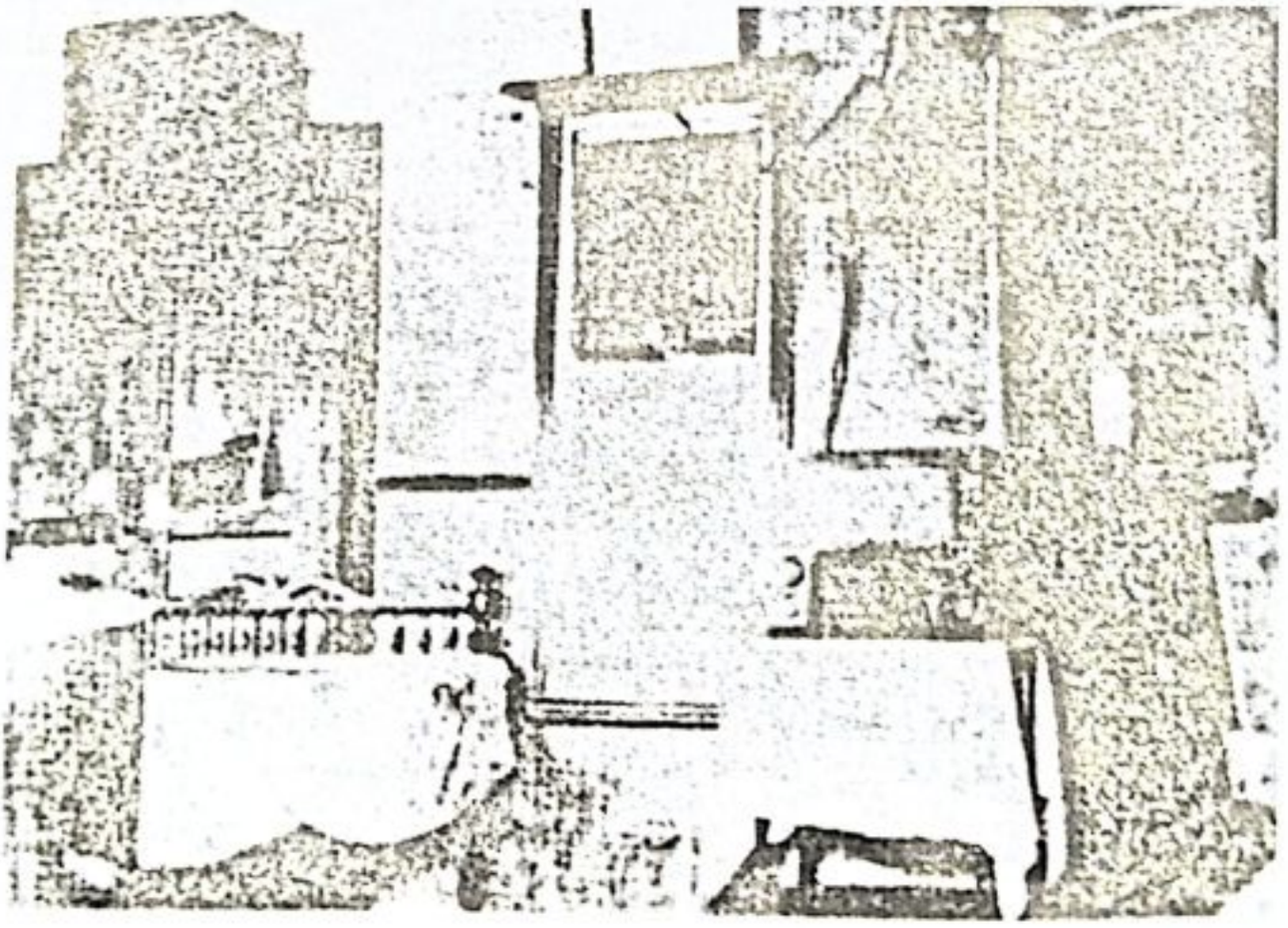
ইকবালের শেষ তিন বছরের বসতবাড়ি, জাবেদ মঞ্জিল, লাহোর



ইকবালের পাঠ কক্ষ



লাহোর 'জাবেদ মঞ্জিলে' ইকবালের কক্ষ



ইকবালের পৈত্রিক বসতি

THE UNIVERSITY OF THE PANJAB.

ARTS

SESSION 1899.

This is to certify that Muhammad [illegible]

son of [illegible] of the Government College, Lahore

has obtained the Degree of MASTER OF ARTS in this University at the Examination in the year 1899 and that he was placed in the [illegible] Class,

the Subject of Examination being Philosophy.

A. W. Chatterton
Registrar.

Countersigned.

W. M. Young
Chancellor
of the University of the Panjab.

REGISTRAR'S OFFICE
LAHORE:
The 4th January 1900

THE UNIVERSITY OF THE PANJAB.

ARTS.

SESSION 1897.

This is to certify that Sheikh Muhammad [illegible]

son of Sheikh Muhammad

of the Government College, Lahore

has obtained the Degree of BACHELOR OF ARTS in this University at the Examination in the year 1897, and that he was placed in the Second Division.

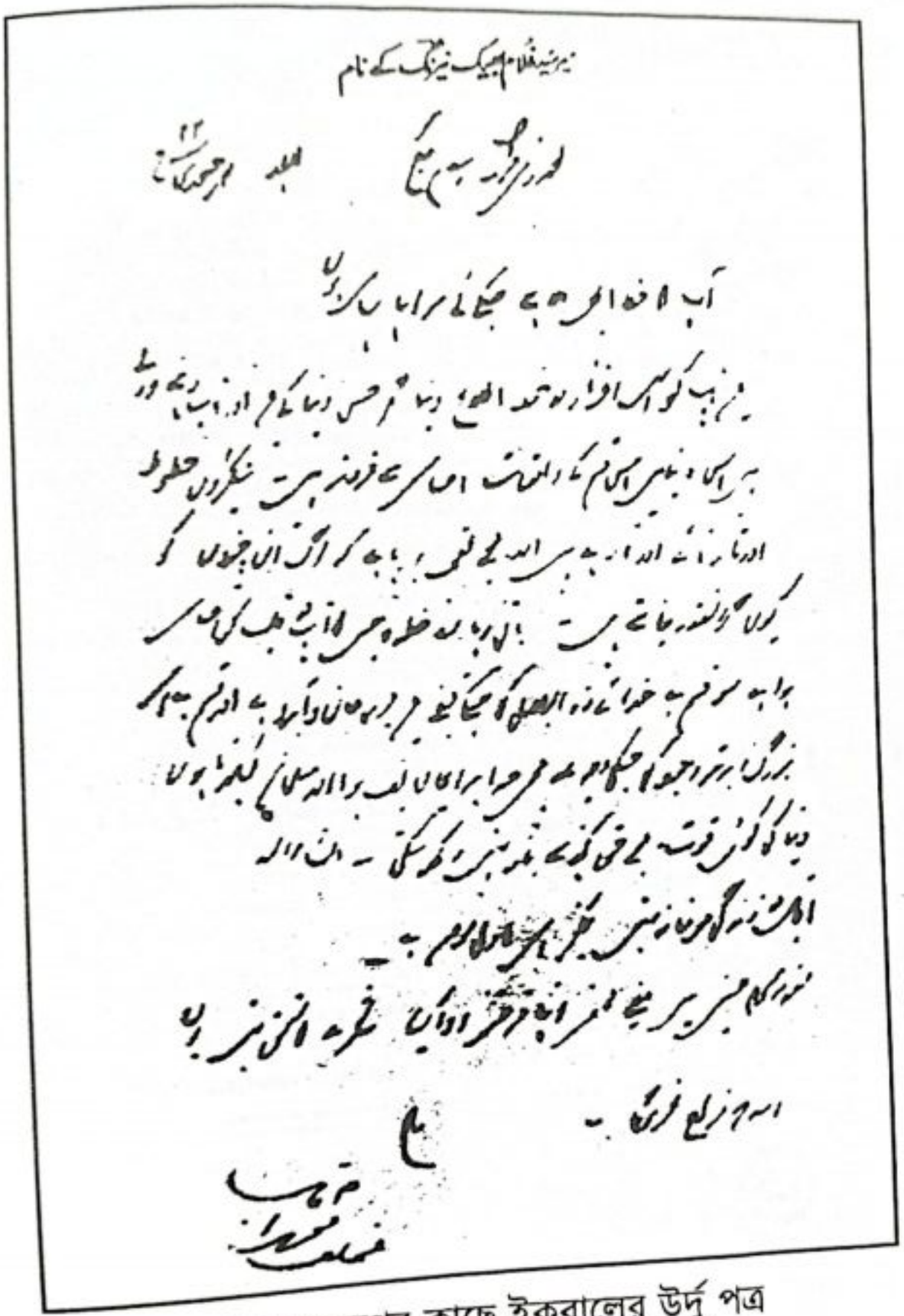
Registrar.

Countersigned.

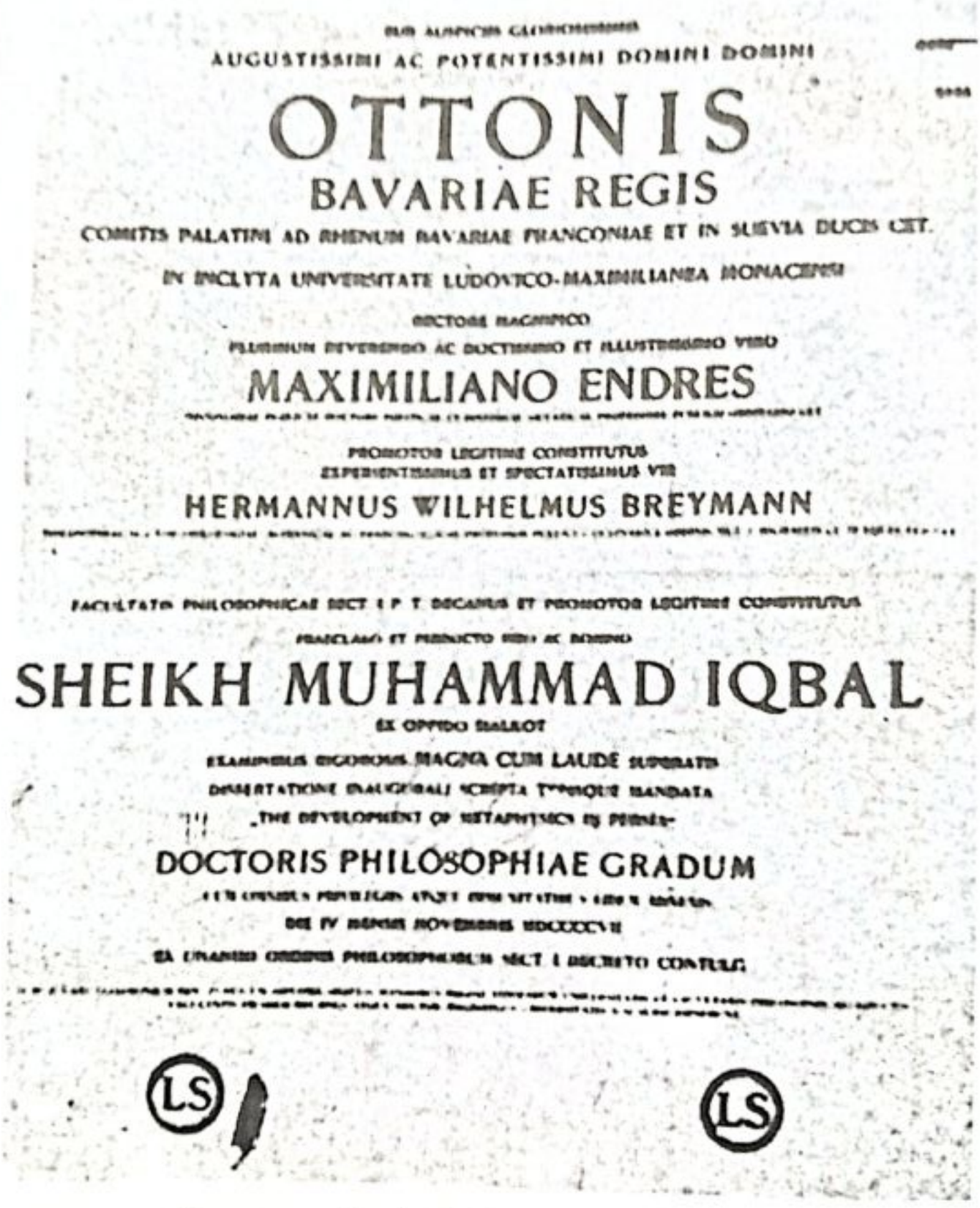
Chancellor of the University of the Panjab.

REGISTRAR'S OFFICE, LAHORE.

The 4th June 1897.



গোলাম বেগের কাছে ইকবালের উর্দু পত্র



AUGUSTISSIMI AC POTENTISSIMI DOMINI DOMINI

OTTONIS

BAVARIAE REGIS

COMITIS PALATINI AD RHENUM BAVARIAE FRANCONIAE ET IN SUEVIA DUCIS CET.

IN INCLYTA UNIVERSITATE LUDOVICO-MAXIMILIANEA MONACENSI

RECTORE MAGNIFICO

PLURIMUM REVERENDO AC DOCTISSIMO ET ILLUSTRISSIMO VIRO

MAXIMILIANO ENDRES

PROMOTOR LEGITIME CONSTITUTUS

EXPERIENTISSIMUS ET SPECTATISSIMUS VIR

HERMANNUS WILHELMUS BREYMANN

FACULTATIS PHILOSOPHICAE SECT. I P. T. DECANUS ET PROMOTOR LEGITIME CONSTITUTUS

FRANCISCO ET PRINCIPATO VIRO AC DOMINO

SHEIKH MUHAMMAD IQBAL

EX OPPIDO SIALKOT

EXAMINIBUS RIGOROSIS MAGNA CUM LAUDE SUPERATIS

DISSERTATIONE INAUGURALI SCRIPTA TYPISQUE MANDATA

"THE DEVELOPMENT OF METAPHYSICS IN PERSIA"

DOCTORIS PHILOSOPHIAE GRADUM

DIE IV MENSIS NOVEMBRIS MDCCCCVII

EX UNANIMI ORDINIS PHILOSOPHICI SECT. I DECRETO CONFERRI

LS

LS

ইকবালের ডক্টরেট ডিগ্রীর সনদ– ১৯০৭ খ্রী.

উপমহাদেশের স্বনামধন্য কবি স্যার আল্লামা ইকবাল। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, প্রবন্ধকার এবং রাজনীতি বিশারদ। উর্দু কাব্যের ইতিহাসে তিনি যুগ প্রবর্তক কবি। ভারতের মুসলমান কবিগণের মধ্যে একমাত্র ইকবালই মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন, আর তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি পড়েছিল ইসলামের শিক্ষা দীক্ষার উপর। ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকেই আপন প্রতিভাবলে এবং একনিষ্ঠ সাধনায় রূপায়িত করে তুলেছেন তাঁর কাব্য সমষ্টিতে। ইকবাল মানসে এই ইসলামী ভাবধারায় প্রণোদিত করার মূলে বিশেষভাব কার্যকর হয়েছিল শিয়ালকোটের বিখ্যাত আলেম মীর হাসান-এর সাহচর্য। ইসলাম থেকে শুধু তিনি অনুপ্রেরণাই গ্রহণ করেননি, অপূর্ব প্রতিভাবলে ইসলামের সার্বজনীনতা কাব্য-অঙ্গে সঞ্চারিত করে তিনি তাঁর কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। তাই তাঁর বাণী মুসলমান, হিন্দু ও খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। মানুষের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান এবং মানবের চিরন্তন মঙ্গলবাদ তাঁর মধ্যে বিরাজ করছিল বলেই ইকবাল তাঁর কাব্যে এই সর্বাধিক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামের মহান ভূমিকার যে পরিচয় ইকবাল দিয়েছেন তা যেমন আদর্শিক, তেমনি বাস্তব দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল।